দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

৬২ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ।। ৬ আষাঢ় ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২১ জুন, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ল বেড়াল

অর্জুন-ইউনিয়ান কার্বাইড যোগাযোগ ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অর্জুন সিং তখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। সেইসময় তাঁর ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়কে ইউনিয়ান কার্বাইডের পক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকা দান করা হয়েছিল। যদিও এই কাজটিকে আইনত বে-আইনী বলা যাবে না। কিন্তু প্রশ্নটা উঠছে, আজ থেকে সিকি শতাব্দী আগে বিমানে চেপে ইউনিয়ান কার্বাইডের প্রধান ওয়ারেন অ্যান্ডারসন কিভাবে পালিয়ে যেতে পারলেন? এর পিছনে যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ছিল তা আজ দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। কিন্তু এর পেছনে অর্জুন সিংহের কি স্বার্থ রয়েছে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে। আর তা দেখতে গিয়েই বেরিয়ে পড়েছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেদিনের সেই পাইলটও জানিয়েছে, অর্জুন সিংহের অফিস থেকেই '৮৪-তে ঘটনার সময় নির্দেশ এসেছিল বিমান ফাঁকা করে স্রেফ অ্যান্ডারসনকে নিয়ে পাড়ি দেবার। চুরহাট চিলড্রেন'স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নামে দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছিল অ্যান্ডারসনের সংস্থাটি। 'ডোনেশন কালেক্টেড ফর বিল্ডিং ফ্রম ইউনিয়ান কার্বাইড'—এই হেডে টাকা দেওয়া হয়েছিল। সোসাইটির অ্যাকাউন্ট অডিট করার কপি-তে দেখা গিয়েছে ১৯৮৩ সালের ১৫ জুন সেটি অডিট করা হয়। ডোনেশন ধার্য করা হয়েছিল ১৯৮২ সালের ১ জুন থেকে ১৯৮৩-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৪-তে ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫—এই টার্মে প্রথমবারের জন্য মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অর্জুন সিং। ভূপাল কেন্দ্রিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এস. এন. গুপ্তা চুরহাট সোসাইটির হিসেবের খাতাপত্তর অডিট করতেন। তিনিও ওই লেনদেনের ব্যাপারটি স্মরণ করতে পারছেন বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ওই অডিটের খাতায় এস. এন গুপ্তা ছাড়াও আরেকজনের সই রয়েছে। তিনি অজয় সিং। অর্জুন সিংহের এক পুত্রের নাম অজয়। এই অজয় সিং অর্জুনপুত্র কিনা তা জানার আপাতত কোনও উপায় নেই। কারণ ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর অর্জুনপুত্র গা ঢাকা দিয়েছেন।

অর্জুন সিং

অ্যাণ্ডারসন

আসলে দুর্ঘটনা ঘটার আগে অবধি ভূপাল শহরে ইউনিয়ান কার্বাইড কোম্পানীটির বেশ নাম-ডাক ছিল। ভূপালেরই অন্য একটি কোম্পানীর প্রাক্তন ম্যানেজার রাজেন্দ্র কোঠারী বলছেন, ''ইউনিয়ান কার্বাইডের নাম-ডাকের কারণেই বিল্ডিং কনট্রাকটর, সরকারি আধিকারিক এবং রাজনীতিকরা একটা সময় কোম্পানীটির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা বলে গর্বিত হতেন। সুতরাং আমি বিস্মিত হব না, যদি দেখি কোম্পানীটি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে।'' মধ্যপ্রদেশের আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্জুন সিং-এর দলীয় সহকর্মী শ্যামাচরণ শুক্ল কিন্তু তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়েই (১৯৬৯) প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইউনিয়ান কার্বাইড সংস্থাটিকে বরাবরই সন্দেহের তালিকায় রেখেছিলেন। বছর দু'য়েক আগে মারা যান শ্যামাচরণ। ১৯৮৪-র ডিসেম্বরে ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটার সপ্তাহ দুয়েক পর একটি হিন্দী দৈনিকে তিনি লিখেছিলেন— ''কার্বাইড কারখানাটির 'ইনটেনশান' প্রথম থেকেই (এরপর ৪ পাতায়)

গ্যাস দুর্ঘটনা রুখতে কার্যকর আইনের দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ এবং সমাজসেবী ডঃ বন্দনা শিবা ভূপাল-গ্যাসলিকজনিত হত্যাকাণ্ডের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে মন্তব্য করেছেন তা অবশ্যই ভাববার বিষয়। তিনি বলেছেন, 'ভূপালে দুটি দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটেছে। একটি অবশ্যই ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৪। যেদিন আমেরিকা ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানী 'ইউনিয়ান কার্বাইড'-এর কারখানা নির্গত বিষাক্ত গ্যাসে হাজার হাজার ভূপালবাসীর মৃত্যু হয়েছিল। অন্যটি অবশ্যই—দীর্ঘ ২৫ বৎসরাধিক প্রলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া। যেখানে সরকার পক্ষের দিক থেকে যাবতীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে 'ইউনিয়ান কার্বাইড'-এর উত্তরাধিকারীদের স্বার্থকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করার নগ্ন প্রয়াস দেখা গেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমেরিকার চাপ ভূপালে জীবিত ও হতভাগ্য পীড়িতদের প্রতি সুবিচার হতেই দেয়নি। আমেরিকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার দায় এভাবেই এড়িয়ে থাকে।' বাস্তব সত্য হলো,—হাজার হাজার মানুষকে হত্যা, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পঙ্গুত্বের বোঝা বওয়ানোর মতো অপরাধের রায় বের হলো দীর্ঘ ২৫ বছর পরে। যা ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থার গোড়ায় গলদ, আইনের মাধ্যমে নীতি-নিয়ম মানানোর অসারতা এবং সর্বোপরি বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনিক অক্ষমতাকে বে-আব্রু করে ছেড়েছে।

সবরকম নীতি তথা আইন-কানুনকে বুড়ো আঙুল

ডঃ বন্দনা শিবা

দেখানোর জন্যই ভূপালে ওইরকম নির্মম নৃশংস গণহত্যা সম্ভব হয়েছিল। প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ম ভাঙার ব্যাপারটাকে চাপা দিয়েছিল। ইউনিয়ান কার্বাইড কারখানা কর্তৃপক্ষ ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী কেমিক্যাল ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকায় ব্যবহার করত। দুর্ঘটনার সতর্কতাসূচক কোনও ব্যবস্থা আইনে থাকলেও বাস্তবে ছিল না। কোম্পানীর মূল মাতৃসংস্থা আমেরিকার 'ইউনিয়ান কার্বাইড কর্পোরেশন' যে প্রযুক্তি ভারতে আমদানি করে ব্যবহার করছিল তারও কোনও নিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র বা অনুমতি ছিল না বলে পরে জানা যায়। এসবই 'ভূপাল গ্যাস লিক'-জনিত গণহত্যাকাণ্ডের পরে গঠিত বরদারাজন কমিটির রিপোর্টে নথিভুক্ত (ডকুমেন্টেড) রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিচার প্রক্রিয়ায় কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিকভাবেই। হত্যা মামলাকে আঁটোসাটো করা যায়নি। কেননা কোনও খেয়ালি জজ (মহামান্য বিচারক) নিন্দনীয় গণহত্যাকে এককথায় নস্যাৎ করে দেন। রাজ্য সরকার নির্লজ্জভাবে মূল অপরাধীকে এসকর্ট করে ভূপালের বাইরে পাঠিয়ে দেন। আর সফল উদ্যমী বর্তমান কেন্দ্র (এরপর ৪ পাতায়)

রাজীব গান্ধীকে আড়ালের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভোপাল গ্যাস কাণ্ডের দায় অর্জুন সিং-এর মতো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও যে এড়িয়ে যেতে পারেন না—বিরোধীদের এই অভিযোগ নস্যাৎ করতে কংগ্রেস তৎপর হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। অ্যাণ্ডারসনকে ছেড়ে দেওয়ার পরের দিন ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর অর্জুন সিং সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন, 'ভোপালের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এবং পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এই

অবস্থায় তাই অ্যাণ্ডারসনকে ভোপালের বাইরে পাঠানো জরুরী ছিল।' এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রণব মুখার্জী কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন যে অ্যাণ্ডারসনকে নিরাপদে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

ভোপাল গ্যাস কাণ্ডে আদালতের রায়ে জনমানসে কংগ্রেস সম্পর্কে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা বুঝে এখন অ্যাণ্ডারসনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হবে বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্য যে 'আই ওয়াশ' মাত্র, ওয়াকিবহাল মহলের তা অজানা নয়। কেননা বিদেশ মন্ত্রকের এক শীর্ষ কর্তারই বক্তব্য, (এরপর ৪ পাতায়)

শাসক দলের কথাতে চলছে যৌথবাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৩১ মে আবারও লালগড়ে মোতায়েন যৌথবাহিনীর রোষে পড়ল লাগোয়া গ্রামগুলির সাধারণ নিরীহ গরীব খেটে খাওয়া আম-জনতা। সকালবেলায় পুলিশ গিয়ে একটি গ্রামের কয়েকজনকে শাসিয়ে আসে। বলে, ''তোরা আজ বিকেলে থানায় যাবি। তোদের ডানা ছাঁটা হবে।'' পুলিশের এই হুমকিতে বাড়ির মেয়ে-বৃদ্ধ-শিশুরা ভয় পেয়ে যায়। ওই শাসানির পরেই পুলিশ স্থানীয় রেশন দোকানে যায়। একজনকে তাদের তালিকার (পুলিশী তালিকা) পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। সে চেনে না বলতেই, প্রকাশ্যে দিনেরবেলায় গ্রামবাসী ও রেশনে আসা গ্রাহকদের সামনে বেধড়ক লাঠিপেটা করে। ভয়ে সবাই বিকেলে থানায় যায়।

তাদেরকে ব্যাপক হুমকি ও মাওবাদী, আদিবাসী ও জনগণের কমিটির সঙ্গে মেলামেশা করার 'গুরুতর অভিযোগ' তোলে। ঘণ্টাখানেক পরে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয় বলে খবর।

চিতলানার জঙ্গলে ৭৬ জন সি আর পি এফ মারা যাওয়ার পরে লালগড়ের

নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তন্ন তন্ন করে বাক্স-প্যাঁটরা তোলপাড় করে মাওবাদী খোঁজা হচ্ছিল। এই হলো যৌথবাহিনী এবং বুদ্ধবাবুর পুলিশ কাম ক্যাডার বাহিনীর ব্যবহার। এসব কতটা মানবিক তা বুদ্ধবাবুই বলতে পারেন।

বুদ্ধবাবু রাজ্য পুলিশের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে গত বছরই রাজ্য পুলিশের মানবিক মুখ নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। বুদ্ধবাবু বলেছিলেন, পুলিশকে মানবিক হতে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানবিক ব্যবহার করতে, সহানুভূতির সঙ্গে অভিযোগ মন দিয়ে শুনতে। ৩৩ বছরের বামরাজত্বে যে পুলিশ বুদ্ধ-বিমানের পার্টি ক্যাডারে পরিণত হয়েছে, তাদের পক্ষে মানবিক হওয়া আজ আর সম্ভব নয় বলেই ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত। পুলিশের অত্যাচারের ফলেই জঙ্গলমহলের মূলনিবাসী জনজাতি-মাহাতো-কুর্মীরা আজ পুলিশ এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে।

২০০৮-এর ২ নভেম্বরের কালো রাতে ছোটপেলিয়া গ্রামে লালগড় থানার ইনচার্জ সন্দীপ সিংহরায় ও তার বশংবদ বাহিনীর লাঠির চোটে লালগড় এলাকার দুই (এরপর ৪ পাতায়)

তালিবানদের মদত দিচ্ছে আই এস আই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। খবরটায় নতুনত্ব কিছু নেই। নতুনত্ব রয়েছে খবরদাতার ক্ষেত্রে। এতদিন ভারতীয় সাংবাদিক, কূটনীতিক এবং রাজনীতিকরা তালিবানদের পেছনে পাকগুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর হাত থাকার যে অভিযোগ করে আসছিলেন তার সত্যতা প্রকাশ পেল লণ্ডন স্কুল অব্ ইকোনমিক্সের সাম্প্রতিক সমীক্ষায়। প্রসঙ্গত, বিশ্বের সর্বোচ্চ দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 'লন্ডন স্কুল অব্ ইকোনমিক্স' অন্যতম। এই সমীক্ষার অন্যতম সমীক্ষক মাট ওয়াল্ডম্যান আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, ''পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আক্রমণাত্মকভাবে কাশ্মীরপন্থী জেহাদী সংগঠনগুলোকে মদত দিচ্ছেন।'' বলা বাহুল্য, ওয়াল্ডম্যানের তীর পাক-রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারির দিকে। ভারতের কূটনীতিকরা যার সম্বন্ধে মনে করছেন যে ইনি আসলে 'ডবল গেম' খেলছেন। প্রকাশ্যে আমেরিকার কাছে তালিবানবিরোধী মুখোশ পরে থাকছেন কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে বিশেষত কাশ্মীরে সেই তালিবানদেরই ব্যবহার করছেন। প্রসঙ্গত, ওয়াল্ডম্যান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষকও বটে। তিনি আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর দৈনিক 'সানডে টাইমস'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—''আমাদের সমীক্ষায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসটা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে সেদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আফগানিস্তান এবং কাশ্মীরে কর্মরত জেহাদি-গোষ্ঠীকে ক্রমাগত (এরপর ৪ পাতায়)

কংগ্রেস বহুদলীয় গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ করতে চাইছে : বিজেপি

পাটনায় 'স্বাভিমান' সমাবেশে নীতিন গড়করি, এল কে আদবানী, সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলি, মুরলীমনোহর যোশী, নরেন্দ্র মোদী, ইয়েদুরাপ্পা, অনন্তকুমার প্রমুখ বিজেপি নেতৃবন্দ।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১২ ও ১৩ এপ্রিল পাটনায় অনুষ্ঠিত বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির দু'দিনের বৈঠকের শেষ দিনে বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তাঁরা অভিযোগ করলেন—দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ব্যাপক বদল এনেছে কংগ্রেস। বিজেপি-র মুখ্যমন্ত্রীদের বক্তব্য—"সারকারিয়া কমিশনের যাবতীয় সুপারিশকে জলাঞ্জলি দিয়ে রাজ্যের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে নতুন পরিকল্পনা ফাঁদছে ইউপিএ সরকার। এই আইন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের বিধানসভায় পাস হচ্ছে। কিন্তু এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোকেই।" এই মর্মে একটি প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে স্বাধীনতার সময় থেকেই ভারতে বহু রাজনৈতিক দল এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র (প্লুরাল ডেমোক্র্যাসী) বিদ্যমান। কিন্তু কংগ্রেস এই ব্যাপারটাকে শ্বাসরুদ্ধ (চোকিং) করতে চাইছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় রয়েছে—যখন গণতান্ত্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোয় ভারতবর্ষ পরিচালিত হচ্ছে তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আশা করছে প্রত্যেক ভারতীয় পুরুষ, মহিলা ও শিশু এমন আচরণ করুক যে আচরণ একমাত্র রাজার কাছে প্রজারাই করতে পারে! অর্থাৎ গণতন্ত্রের গালভরা 'ডেমোক্র্যাসী', 'রিপাবলিক', 'ফেডারেল' ইত্যাদি শব্দবন্ধনীকে জাহান্নামে পাঠিয়ে ভারতবর্ষে আসলে রাজার শাসন (মনার্কি) কায়েম করতে চাইছে কংগ্রেস। বিজেপি-র আঙুল স্পষ্টতই গান্ধী-নেহরু পরিবারের দিকে। জওহরলাল নেহরুর সূচনা করা প্রধানমন্ত্রীর গদিতে একে একে বসেছেন জওহরলাল কন্যা ইন্দিরা এবং ইন্দিরা পুত্র রাজীব। জওহরলালের আমলে শুরু হওয়া সেই ট্র্যাডিশন এখনও সমানে চলছে। নামেই প্রধানমন্ত্রীর গদিতে রয়েছেন মনমোহন সিং। বকলমে সংসার চালাচ্ছেন রাজীব পত্নী সোনিয়া। হয়তো আগামীদিনে সোনিয়া পুত্র রাহুলকে 'প্রোজেক্টেড প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে তুলে ধরতে পারে কংগ্রেস। এবং তা বোঝাই যাচ্ছে, মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও আদতে ভারতে নেহরু-গান্ধী পরিবারতন্ত্র কায়েম করতে চাইছে কংগ্রেস। আসলে স্বাধীনতার সময়ে একমাত্র অস্তিত্ববাহী 'জাতীয় দল' হবার কারণে সাধারণ মানুষের মনে কংগ্রেস সম্পর্কে যে 'দুর্বলতা' কাজ করছিল তারই ফসল ঘরে তুলেছে গান্ধী নেহরু পরিবার। সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মতো অতি বিশ্বস্ত বন্ধু পেয়ে যাওয়ায় তাতে সোনায় সোহাগা হয়েছিল।

কিন্তু কংগ্রেসের পথের কাঁটা স্বাধীনতার সময় থেকেই ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। আজ তাঁরই রাজনৈতিক উত্তরসূরীরা একইভাবে কংগ্রেসের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বিজেপি শাসিত রাজ্যের প্রতি কংগ্রেসের বিমাতৃসুলভ মনোভাব বজায় রয়েছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৩ তারিখ বিজেপি শাসিত সবকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখপাত্র হিসেবে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গান্ধী-নেহরু রাজতন্ত্র দিয়ে ধ্বংস করার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন—'ইউ পি এ সরকার আসলে এর মাধ্যমে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই অপমান করেছে। আমাদের জাতীয় কর্মসমিতি এনিয়ে সরাসরি মনমোহন সিং সরকারকে চার্জশিট ধরাচ্ছে। ইউ পি এ যা করছে তাতে ভারতীয় গণতন্ত্রের একাধিকত্বের ওপর তাদের অসহনীয়তাই প্রকাশিত হচ্ছে।' বিজেপি-র মুখপাত্র রাজীব প্রতাপ রুডি জানিয়েছেন জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক থেকে ফিরে দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মোদী বিস্তারিত পরিকল্পনা করবেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে বিজেপি আগামীদিনে আন্দোলনের পরিকল্পনা করবে। আসলে ভোটযুদ্ধে নরেন্দ্র মোদীকে কিছুতেই কাবু করতে না পেরে বারবার হ্যারাস করার চেষ্টা হয়েছে তাঁকে। গুজরাত দাঙ্গা নিয়ে সম্প্রতি বিশেষ তদন্তকারী টিমের কাছে তিনি গরহাজির বলে অভিযোগ করে কংগ্রেস, অথচ হাজিরা দেবার নোটিশ-ই ধরানো হয়নি তাঁকে। তার ওপরে কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাস বিরোধী আইন 'এম কোকা' চালু হলেও, গুজরাতে অনুরূপ আইন 'গুজ কোকা' আইন চালু করতে বারবার ব্যাগড়া দিচ্ছে কংগ্রেস। এই কংগ্রেসী বঞ্চনার প্রতিবাদেই আগামীদিনে সরব হবেন মোদীরা।

এই সময়

জনতার গুঁতো

ভূপাল গ্যাস কাণ্ডে ভারি মুশকিলে পড়ে গেছে কংগ্রেস। অসুস্থ অর্জুন সিং থেকে প্রয়াত রাজীব গান্ধী—কংগ্রেসের তাবড় তাবড় অনেক নেতার নামই অকস্মাৎ জুড়ে যাচ্ছে দুর্ঘটনা কাণ্ডে। দেশজোড়া চাপের মুখে সংসদেও তাই 'কংগ্রেসী নাটুকে ভেল্কিবাজী ' শুরু হয়েছে। কংগ্রেস একবার বলছে—'ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে পালাতে না দিয়ে উপায় ছিল না', পরক্ষণেই বলছে—'অ্যান্ডারসনকে প্রত্যর্পণের ব্যাপারে আমেরিকাকে চাপ দেবে ভারত।' এহেন নাটুকেপনায় স্বজন হারানো ভূপালবাসী যে ফুঁসছেন, সেটা উপলব্ধি করেই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন—'দশদিনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মন্ত্রিগোষ্ঠী ট্রায়াল কোর্টের আদেশ খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট জমা দেবে।'

আদালতী কড়চা

কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি ডি ভি শৈলেন্দ্রকুমারের ওপর বেজায় রুষ্ট হয়েছেন প্রধান বিচারপতি পি ডি দিনাকরণ। কারণটা আর কিছুই নয়, শৈলেন্দ্রকুমার মাঝে মধ্যেই প্রচন্ড রেগে যাচ্ছেন। রেগে গিয়ে কাকে যে কি বলছেন তার ঠিক থাকছে না। অধস্তনের কাছে দু'কথা শুনতে কোন্ 'বস'-এরই বা ভালো লাগে? তার ওপরে শৈলেন্দ্র একবার রাগের মাথায় নিজের ব্লগে সুপ্রিম কোর্টকে 'ফণা হীন সর্প' (সার্পেন্ট উইথআউট ফ্যাংস) বলে অভিহিত করেছিলেন। দিনাকরণ শৈলেন্দ্রের এতটা বাড়াবাড়ি আর সহ্য করতে পারেন নি। গত ১৪ তারিখ শৈলেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করেছেন সুপ্রিম কোর্টে।

ঘণ্টায় পঞ্চাশ কি.মি.

রেলগাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার। নির্ঘাৎ চমকে উঠছেন? আঁতিপাতি করে বোঝার চেষ্টা করছেন, ছাপার ভুল হলো কিনা। মানে গরুর গাড়ি লিখতে গিয়ে রেলগাড়ি লেখা হয়ে গেছে কিনা! চোখ-টোখ কচলে নিয়েও দেখতে পারেন, আপনার চোখের কোনও ব্যারাম হয়নি। আপনি ঠিকই পড়েছেন যে রেলগাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র ৫০ কিলোমিটার। আসলে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার বন্দোবস্ত না করতে পেরে এহেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক। সম্প্রতি জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে রেলমন্ত্রকের এহেন সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় ঘণ্টায় ৫০ কিমি বেগে চলবে ট্রেন। প্রশ্নটা থেকেই যায়—এতে যাত্রীরা বাঁচবেন তো?

কোর্টের গুঁতো

বলছি ভালো একজন জ্যোতিষীর সন্ধান দিতে পারেন? যেমন-তেমন হলে হবে না কিন্তু! তাঁকে ত্রিকালজ্ঞ হতে হবে, তন্ত্রসাধক হতে হবে, মায় পিশাচসিদ্ধ হওয়াটাও আবশ্যিক। কি বললেন? খদ্দের কে? খদ্দের জাঁদরেল মশাই! স্বয়ং ইউ পিএ সরকার! উফ্ কি গেরোই না লেগেছে। যাতে হাত দিতে যাচ্ছে তাই কেলো হয়ে যাচ্ছে। এই যেমন, দিন কতক আগে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে সহ একদল শ্রীলঙ্কান মন্ত্রীকে ধুম-ধাম করে ডেকে এনে বিস্তর দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। কিন্তু রাজাপক্ষের টিমে ছিলেন মন্ত্রী ডগলাস দেবানন্দ। যার নামে চেন্নাই হাইকোর্টে একাধিক মামলা ঝুলছে; কখনও দেব নামে, কখনও আনন্দ নামে। চেন্নাই উচ্চ-ন্যায়ালয় তাই সরকারের কাছে জবাবদিহি চেয়েছে, চেন্নাই পুলিশ দিল্লীকে জানানো সত্ত্বেও দেবানন্দকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো না?

মুদ্রা-রাক্ষস

গরমের মেয়াদ গোটা দেশেই প্রায় খতমের মুখে। বৃষ্টিও মোটামুটি সর্বত্রই এসে গেছে। অনাবৃষ্টির দরুণ খরার কোনও খবর আপাতত নেই। কিন্তু প্রতিকূল এই পরিস্থিতির মধ্যেও মাথা-চাড়া দিয়েছে মুদ্রা-রাক্ষস। মে-মাসে সার্বিক মুদ্রা-স্ফীতির হার পৌঁছে গিয়েছে ১০.১৬ শতাংশ। যা গত উনিশ মাসে সর্বোচ্চ। খাদ্য-মুদ্রাস্ফীতি ক্রমাগত বাড়ছিলই; তবে মে মাসে তাতে কিছুটা হলেও লাগাম পরানো সম্ভবপর হয়েছে। এপ্রিল নাগাদ খাদ্য-মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল যেখানে ১৬.৮৭ শতাংশ, মে মাসে তা সামান্য কমে হয়েছে ১৬.৪৯ শতাংশ। সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক কৌশলে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম, নাভিশ্বাস উঠছে গরীব-মধ্যবিত্তের। এই অসহায় অবস্থারই বাহ্যিক রূপ মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি। মনমোহনীয় অর্থনৈতিক ম্যাজিক আগামীদিনে না ঘটলে এই 'বৃদ্ধি' আরও বৃদ্ধি পাবে।

আগমনী

তিনি এলেন। অসহ্য ভ্যাপসা গরমে টেকা দায় হয়ে গেছিল। অবশেষে গত ১৩ তারিখ হাসি ফুটল বঙ্গবাসীর মুখে। কারণ ১২ তারিখ রাতের বৃষ্টিকে তাঁরা এক প্রকার উপেক্ষাই করেছিলেন। ভেবেছিলেন জষ্ঠি মাসে কালবোশেখী'র তাড়নায় বোধহয় দু-এক পশলা হচ্ছে। কিন্তু রোববার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। আবহাওয়া দপ্তর জানাল প্রাক বর্ষা নয়, একেবারে বর্ষাই এসেছে। তাই বাঙালীর মুখ আহ্লাদে আটখানা, একে রোববার তায় বৃষ্টি। খিচুড়ির সাথে ইলিশ ছাড়া জমে! জল-কাদা মেখে জ্যৈষ্ঠের শেষে দোলের আনন্দে উদ্বেলিত বাঙালী থলে হাতে বাজারে গিয়ে শুনল ইলিশ কেজি প্রতি ৩৫০ থেকে ৬০০ টাকা। পকেটের দিকে করুণ মুখে তাকিয়ে বঙ্গবাসী খুঁজল পাঠার মাংস, দাম শুনল কেজি প্রতি ৩০০ টাকা; নিদেনপক্ষে খুঁজল মুরগীর মাস, এর দাম শুনল কেজি প্রতি ১৬০ টাকা। এমন দিনে বৃষ্টি মানায়? কখখনও না।

খনিজ আবিষ্কার

খনির সন্ধান মিলল আফগানিস্তানে। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ খনিটির খোঁজ পেয়েছেন আমেরিকানরা। তাঁরা বলছেন ডলার ১ ট্রিলিয়ন খনিজ পদার্থ থাকতে পারে ওই খনিটিতে। এই খনিজ ঠিক-ঠাক কাজে লাগালে আফগানিস্তানের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকানরা এটাকে আদৌ আফগানিস্তানের ভোগে লাগাতে দেবে তো? পূর্বাপর অভিজ্ঞতা কিন্তু খুব একটা সুখের নয়।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভূপাল গ্যাস লিক কাণ্ড ঃ আমেরিকা ও পরমাণু দায়বদ্ধতা বিল

বেশ কয়েক মাস যাবৎ-ই আমেরিকা পরমাণু দায় এড়ানোর নামান্তর পরমাণু দায়বদ্ধতা বিল পাশ করাইবার জন্য ভারত সরকার তথা কেন্দ্রের কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত ইউ পি এ সরকারকে প্রথমে অনুরোধ, পরবর্তীকালে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিতেছিল। দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী দেশবাসী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমী মহল পরমাণু দায়বদ্ধতা বিলকে কার্যত পরমাণু বিপর্যয়ের দায়বদ্ধতা এড়ানোর বিল বলিয়া অভিহিত করিয়া এই বিল সংসদে পাশ করাইবার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ইউ পি এ-১ সরকারের সমর্থনকারী বামপন্থীরাও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার কল্কে হারাইয়া এখন স্বদেশপ্রেমী সাজিয়াছে। তাহারাও এখন পরমাণু দায়বদ্ধতা বিল পাশ করাইবার তীব্র বিরোধিতা করা শুরু করিয়াছে।

পরমাণু দায়বদ্ধতা হইতে মার্কিন পরমাণু শক্তি অর্থাৎ পরমাণু চুল্লী সরবরাহকারী কোম্পানীগুলিকে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংসদে পরমাণু দায়বদ্ধতা বিল পাশ করাইবার জন্য যে ধরনের মোসাহেবি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের দালাল একদল বুদ্ধিজীবী করিয়া চলিতেছিলেন, ভূপাল গ্যাস লিক নামক গণহত্যা মামলার রায় প্রকাশিত হইবার পর জনগণের রোষ দেখিয়া তাহারা এখন ফাঁকতাল খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ রায় লইয়া কংগ্রেসের বর্তমান ও প্রাক্তন মন্ত্রী, নেতা ও আমলাগণের মধ্যে যে পারস্পরিক খেয়োখেয়ি শুরু হইয়াছে তাহাতে এখন অনেক তথ্যই জনগণের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে যাহা এই সকল মোসাহেবদের পক্ষে হজম করা মুশকিল হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের মার্কিন প্রেম যে দেশবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী ও জাতিবিরোধী ছিল তাহা আড়াল করাই মুশকিল হইয়া পড়িতেছে।

২৬ বৎসর পূর্বে ১৯৮৪ সালের ২রা ডিসেম্বরের মধ্যরাতে ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা এক মামুলি গ্যাস লিক ছিল না। এটি ছিল এক মর্মান্তিক গণহত্যা। ভূপাল শহরের ৪০ বর্গ-কিলোমিটার এলাকা জুড়িয়া যে মারণ-যজ্ঞ সেই রাতে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার নজির বোধ করি আধুনিক মানব ইতিহাসে বিরল। সেই রাতে ভূপাল শহরটিই প্রায় পরিণত হইয়াছিল গ্যাস চেম্বারে। কয়েক ঘণ্টার সেই মারণ-যজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিয়াছিল ১০ হাজার মানুষ। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫,০০০-এ। বামপন্থী পত্রিকাগুলির মতে এই সংখ্যা ৫০,০০০। আর বিজ্ঞানীদের মতে এর প্রতিক্রিয়া চলিবে দু-তিন প্রজন্ম ধরিয়া, ঘরে ঘরে জন্মাইবে মূক বধির, অন্ধ, বিকলাঙ্গ।

ভূপাল শহরের ঘন জনবসতি অধ্যুষিত এলাকায় এক ধরনের প্রাণঘাতী বিষাক্ত গ্যাস মিথাইল আইসো-সায়ানাইড (মিক) এবং আলফা ন্যাপথার রাসায়নিক মিশ্রণ 'সেভিন' নামক কীটনাশক এই কারখানায় উৎপাদিত হত। এই প্রাণঘাতী কীটনাশক তৈরির প্রযুক্তি সরবরাহকারীও ছিল এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র;যারা আজ পরমাণু চুল্লী সরবরাহ করিবার জন্য আগে-ভাগে এই ধরনের বিপর্যয়ের দায় এড়ানো বিলটি ভারতীয় সংসদে পাশ করাইবার তাল করিতেছিল।

কংগ্রেস দলের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারীদের সংখ্যা যে নেহাৎ কম নয়, তাহা প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্র মারফৎ দেশের মানুষ জানিতে পারিতেছে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীতো বটেই, এমনকী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিও যে মার্কিনী বণিকদের স্বার্থ চরিতার্থ করিতে সদা ব্যস্ত থাকিত তাহা আজ জানা যাইতেছে। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি নাকি সি বি আই-র দেওয়া ৩০৪(২) ধারার চার্জ বদল করিয়া ৩০৪(এ) ধারা করিয়া দেয়। কারণ ৩০৪(এ) ধারাটি কেবল মামুলি গাড়ি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর ৩০৪(২) ধারাটি প্রযোজ্য হয় গণহত্যার ক্ষেত্রে। কারখানার চেয়ারম্যান অ্যান্ডারসনকে গোপনে প্রথম ভূপাল ও পরে দেশ হইতেই পালানোর রাজকীয় পথ এই কংগ্রেসীদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারই করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফলস্বরূপ এই ৫০,০০০ মানুষের পর্বত প্রমাণ হত্যাকাণ্ডর যে রায় (২ বছরের জেল ও সাথে সাথে বেল) আমরা দেখিয়াছি, তাহাকে পর্বতের মুষিক প্রসবই কেবল বলা যায়।

এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ও ভূপাল কাণ্ডে মার্কিনীদের ভূমিকায় পরমাণু দায়বদ্ধতা বিল পাশ করানোটি কত বিপজ্জনক হইতে পারে তাহা জনগণের ভাবিয়া দেখা উচিৎ।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমার দেশ শ্রেষ্ঠ, আমার জাতির আচার, বিচার, ধর্ম, চরিত্র, নীতি, বল বিক্রম, বুদ্ধি, মত, কর্ম উৎকৃষ্ট, অতুল্য এবং অন্য জাতির পক্ষে দুর্লভ—এই অভিমান; আমার দেশের হিতে আমার হিত, আমার দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশভাই-এর বৃদ্ধিতে আমি বর্ধিত—এই বিশ্বাস; কেবল আপনার স্বার্থসাধনা না করিয়া তাহার সহিত দেশের স্বার্থ সম্পাদন করিব, দেশের মান, গৌরব ও বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য, আবশ্যক হইলে সেই যুদ্ধে নির্ভয়ে আত্মবিসর্জন করা বীরের ধর্ম, এই কর্তব্য-বুদ্ধি জাতীয় ভাবের প্রধান লক্ষণ।

—ঋষি অরবিন্দ

যুদ্ধ নয়, সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার এখন ধর্মান্তরকরণ

তারক সাহা

অষ্টাদশ শতকে বণিকের মানদণ্ড বদলে গিয়েছিল শাসকের রাজদণ্ডে। দিন বদলেছে, পাল্টে গেছে দুনিয়ার চালচিত্র। সেই সঙ্গে বদলে গেছে সাম্রাজ্যবাদের কর্মপন্থা। ব্যবসায়ীর মোড়কে লর্ড ক্লাইভ দুনিয়ার অন্য দেশের মতো এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। এক —গায়ের জোরে বা কৌশলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার এবং দুই—প্রলোভন বা অসহায়তার সুযোগে ধর্মান্তরকরণ।

ওপরের দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই। নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করা। আজ যেহেতু সময় পাল্টেছে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ না করে বরং ভয় প্রলোভন দেখিয়ে বা সেবার আড়ালে দেশে দেশে চলছে সংস্কৃতি পাল্টে দেবার যুদ্ধ। এ বিষয়ে বিশ্বের দুটো প্রধান ধর্মই সিদ্ধহস্ত। খৃস্টান এবং ইসলাম — দুটো ধর্মই একই কায়দায় এদেশে ধর্মান্তরকরণ করে চলেছে।

দুনিয়ার নিরীখে এই ধর্মান্তরকরণের উপায় ও পন্থার বিশ্লেষণ করা খুব জরুরী। বিগত শতকে পশ্চিমী দেশগুলির লক্ষ্য ছিল নিজ নিজ দেশের বেকার সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে অস্ত্র কারখানাগুলির রমরমা কারবার বজায় রাখা। আর এজন্য রাশিয়ার নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট শক্তি ও আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সারা দুনিয়াকে দু ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। গত শতক দেখেছে দুটো বিশ্বযুদ্ধ, তিনটে পাক-ভারত যুদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক-ইরান সহ আরও কত কী। কম্যুনিস্ট দুনিয়ার পতনের পর এক মেরুর দুনিয়ায় বিশ্বে আপাত শান্তি। ২০০৯ সালে দুনিয়াজুড়ে ভয়াবহ আর্থিক মন্দার কারণ হিসেবে অভিজ্ঞেরা অস্ত্র কারখানাগুলির সীমিত উৎপাদনকে অন্যতম বলে মনে করছেন।

যাই হোক, যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য জয়ের বিষয়টা আজকের যুগে সেকেলে। সুতরাং বিশ্বেজুড়ে চালাও সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হানাহানি, রক্তপাতের আশঙ্কা কম। বরং চুপিসারে সেবার নামে, শিক্ষার নামে ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে দুনিয়া জয়ের এই অভিনব পন্থা অনেক স্বস্তিদায়ক। বর্তমান দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে যুদ্ধ নয়, বরং বিশ্ব কল্যাণে অহিংসার আড়ালেই প্রকৃষ্ট উপায়। যেমন মহারাজা অশোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন শ্রীলঙ্কা, চীনে। হিন্দুরাও এইভাবেই সারা দুনিয়ায় সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সুদূর আফ্রিকা, আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন।

অধীনস্থদের ওপর সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তারের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের ক্ষমতা চাপাতে চায়। তারা চায় তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পণ্য। অনেকটা ভোগ্যপণ্যের বাজারের মতো তাদের উৎপন্ন বস্তুই সেরা এমনটা প্রতিপন্ন করাই ধনতান্ত্রিক দেশের লক্ষ্য। তারা তাদের অঢেল ঐশ্বর্য্য এখন তৃতীয় বিশ্বের গরীব গুর্বোদের মধ্যে সেবার নামে, সামাজিক কাজের মোড়কে পাঠাচ্ছে।

মুসলিমদের ধর্মান্তরকরণ অন্য রকমের। এদের পয়সা জোগায় সৌদি আরব বা তেল রপ্তানীকারী মুসলিম দেশগুলি। কোটি কোটি পেট্রো ডলার পাঠাচ্ছে হাওলার মাধ্যমে এই দেশের বিভিন্ন অনুন্নত মুসলিম প্রভাবিত এলাকায়। মসজিদ্, মাদ্রাসা স্থাপন করে খুল্লাম-খুল্লা ধর্মের প্রচার চালাচ্ছে। তৈরি করছে জেহাদী, যাদের কাজ হলো সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বী তথা হিন্দুদের উৎখাত করে এলাকাগুলিকে হিন্দু শূন্য করা এবং তা তারা করে চলেছে সরকারের নাকের ডগায়।

অতীতে বৃটিশ শাসকেরা তাদের প্রশাসনের উপযোগী তাঁবেদার, ধামাধরা এক শ্রেণীর মানুষ বানিয়েছিল। এদের মধ্যে আবার অনেকে খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতও হয়েছিল। দেশে এক শিক্ষানীতি না থাকায় বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা শিক্ষা প্রসারের সুযোগে দেশজুড়ে যে সব মিশনারী স্কুল চালাচ্ছে তাতে সমাজের ওপরতলার মানুষজনও যেমন সামিল তেমনি সামিল ফুটপাথে কুড়িয়ে পাওয়া বা অনাথ শিশুরাও। চার্চ-ই তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে এমন সব শিশুদের শিক্ষা দিচ্ছে ওইসব স্কুলগুলিতে। আপাত নিরীহ এই সেবামূলক কাজ দেশের পক্ষে সমূহ বিপদ। বিপন্ন অভিভাবকহীন এইসব শিশুরা কোনওদিনই চার্চের বিরুদ্ধে মুখের হতে পারবে না। চার্চ এদেরকে ভারতবিরোধী, সমাজবিদ্বেষী এক গোষ্ঠী করে গড়ে তুলছে এবং এইসব প্রশিক্ষিত যুবকদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিচ্ছে ধর্মপ্রচারে। এদেরকেই হিন্দু সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে জঙ্গি বানিয়ে তুলছে চার্চ। বেশ কয়েকবছর আগে আর এস এসের চারজন কার্যকর্তাদের ত্রিপুরায় অপহরণ করে হত্যা করে চার্চ প্রশিক্ষিত জঙ্গিরা।

মার্কিন মদতপুষ্ট খৃস্টান মৌলবাদীরা ধর্মকে হাতিয়ার করে স্থানীয় স্তরে নিজেদের জাল বিস্তার করে চলেছে। স্থানীয় স্তরে নিম্নবর্গের মানুষদের ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে খৃস্টান জনসংখ্যার বৃদ্ধির এই নেটওয়ার্ক চলছে ভারত সহ শ্রীলঙ্কা সমেত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, যেখানে জাত-পাতের ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজন আজও চালু। সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কাজে লাগিয়ে ধনী দেশগুলি ধর্মান্তরের মাধ্যমে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে জনজাতি অধ্যুষিত, অনুন্নত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির খনিজ সম্পদকে কব্জা করতে চাইছে।

ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে মিশনারীদের মূল লক্ষ্য হলো ধর্মান্তরকারীর মধ্যে স্বদেশ ও নিজেদের সমাজ সম্বন্ধে এক হীনমন্যতা সৃষ্টি করা। বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অপপ্রচারের মধ্যে দিয়ে ধর্মান্তরকারীদের মনে এক সংশয় তৈরি করা, এমন একটা ধারণা তৈরি করা যে, চার্চের প্রচারিত ধর্মই দুনিয়া সেরা। ধর্মান্তরকরণের আগে ধর্মান্তরকারীদের মনে এতদিন মেনে আসা ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণবিধি সম্পর্কে বিষিয়ে তুলতে মিশনারীরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখে না।

সবচেয়ে ঘৃণ্য চক্রান্ত হলো যে, ধর্মান্তরকারীদের বলা হয় তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের দেবমূর্তির ছবি সঙ্গে আনতে। প্রার্থনা শুরুর আগে পোপের ছবি তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলা হয়—যেসব উপাস্য দেবদেবীর মূর্তি তারা সঙ্গে এনেছে তা ছিঁড়ে বা ধ্বংস করে ফেলতে। এমন অবস্থায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয় যখন এই কাজ তারা করতে বাধ্য হয়। সেই অবস্থান থেকে ধর্মান্তরকারীদের আর নিজ নিজ ধর্মে ফিরে আসার পথ থাকে না। তাদেরকে বোঝানো হয় মানুষ জন্মেই পাপকে সম্বল করে এবং তার মুক্তির একমাত্র উপায় খৃস্টান ধর্মান্তরকরণ। ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্য হলো দ্বিমুখী আক্রমণ। দু'রকমভাবে সমাজকে আক্রমণ করে এরা। সমাজের দলিতবর্গ হলো এদের সহজতম টার্গেট। গণতন্ত্রে সংখ্যাধিক্য সবচেয়ে বড় কথা। সমাজের দলিত, গরীবদের মধ্যে অর্থ বিলিয়ে বা সেবার মাধ্যমে এদের মন জয় করা সহজ। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল বা দেশের বনাঞ্চলগুলিতে এরা মুখ্যত ধর্মান্তরকরণ এভাবেই চালায়। আর সমাজের ধনীসমাজকে এরা কব্জা করে প্রধানত একাকীত্বকে লক্ষ্য করে। ধনিক সম্প্রদায়ের অনেকেই একাকী জীবন যাপন করে। এদের প্রলুব্ধ করে বৃদ্ধাশ্রমের মাধ্যমে। যেখানে মানুষ ছোটে একাকীত্ব ঘুচিয়ে বাকি জীবন কাটাতে।

বিদেশী মদতপুষ্ট সংস্থাগুলি দেশকে পুনরায় সাংস্কৃতিক উপনিবেশে পরিণত করতে সচেষ্ট। আমাদের দেশের আইনকে আরও বেশী কঠোর করতে হবে, সচেতন হতে হবে আমাদের যাতে বিনা ব্যয়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবার বিনিময়ে আমাদেরই দেশের মানুষ ধর্মান্তরিত হতে না পারে। স্বামীজীর কথায়, একজন ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম থেকে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে হিন্দুর সংখ্যা শুধু একজন কমে না বরং একজন শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

মার্কিন মদতপুষ্ট খৃস্টান মৌলবাদীরা ধর্মকে হাতিয়ার করে স্থানীয় স্তরে নিজেদের জাল বিস্তার করে চলেছে। স্থানীয় স্তরে নিম্নবর্গের মানুষদের ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে খৃস্টান জনসংখ্যার বৃদ্ধির এই নেটওয়ার্ক চলছে ভারত সহ শ্রীলঙ্কা সমেত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, যেখানে জাত-পাতের ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজন আজও চালু।

॥ সংশোধনী ॥

স্বস্তিকা-র ১৪ জুন, ২০১০ সংখ্যার ৩ পৃষ্ঠায় রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় লিখিত নিবন্ধটির শিরোনাম পড়িতে হইবে—

আদিবাসীদের চোখের জল বুদ্ধদেব প্রশাসনের কানে কবে ঢুকবে ?

বীজ কেলেঙ্কারির শিকার কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন

বি স কে, কলকাতা ॥ ভারতের প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা বানচাল করার জন্য দেশেরই কিছু মানুষ উঠেপড়ে লেগেছে। উন্নতমানের বীজ সরবরাহের নামে এইসব মানুষ নানা কোম্পানির নামের আড়ালে সরল কৃষিজীবীদের ঠকিয়ে চলেছে। ফলে সর্বস্ব বাজি রেখে যে সকল কৃষক চাষ করছেন, ফসল তোলার সময় তারা শূন্য হাতে ফিরছেন। পরিণাম আত্মহনন। এমন ঘটনা দেশের সর্বত্রই ঘটছে। অথচ দেশে এক গণতান্ত্রিক সরকারও আছে, আছে পুলিশ, প্রশাসন, আছে আইন-কানুন। কিন্তু কারও যেন কোনও দায় নেই। এমন পরিকল্পিতভাবে চাষীদের আত্মহননের দিকে ঠেলে দেওয়ার পরও অপরাধীরা আইন রচনাকারী ও রক্ষাকারীদের ছায়াসঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে হতাশ মানুষজন আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। ভগবানের ওপর নির্ভর করছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা।

বিহারে এখনও দানাবিহীন ভুট্টা বীজ মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। এখন আবার গমের ফসল না হওয়ার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকী কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষতিপূরণ কম দেবার সরকারি ঘোষণায় অশান্ত কৃষককুল চরম বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমে কৃষকদের দুর্দশার কোনও খবর ছাপানো হচ্ছে না। ফসল না হওয়ার খবর কেবল ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকার কোনও রকম ছাড়ের ঘোষণা করলেই তা প্রথম পাতায় ছাপা হচ্ছে। ফলে সরকার, সংবাদ মাধ্যম ও মদতপুষ্ট কোম্পানির প্রতি সরল কৃষককুলের যে আস্থা বিনষ্ট হবে তা বলাই বাহুল্য। এর বেশি দরিদ্র কৃষকদের আর করারই বা আছে কি?

বিহারের পূর্ণিয়া, খগড়িয়া, সমস্তিপুর, চম্পারণ সহ বহু জেলায় অন্তত দুই লক্ষ হেক্টর জমিতে বোনা ভুট্টা এবং গম নষ্ট হয়েছে। কোনও দানাই হয়নি। শুধু গাছ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার কেবল ৬৩ হেক্টর জমিতে বোনা ভুট্টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সরকারিভাবে স্বীকার করেছেন। পূর্ব

বীজ কেলেঙ্কারির শিকার।

চম্পারণ জেলার তুরকোলিয়ার চন্দ্রকিশোর সিং, তরুণ কুমার, ধরীক্ষণ শর্মা, খগড়িয়ার হরদিয়ার সোনেশাল যাদব, মীনাপুরের প্রকাশ মহাতোর মতে হতভাগ্য কৃষকরা চ্যালেঞ্জার পায়োনিয়ার-৭, পায়োনিয়ার-৯২, লক্ষ্মী বিকাল্প ৯০৮১, পিনকাল ৯০০ এম প্রভৃতি ব্রাণ্ড কোম্পানির কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করেন। ভুট্টার ফসল নষ্ট হওয়ার পর কৃষকরা বিহারের কৃষিমন্ত্রী রেণুদেবীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। সরকার কৃষকদের ঠাণ্ডা করতে হেক্টর পিছু ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ ফসল বোনার খরচের অর্ধেক হওয়ায় কৃষকরা দারুণ ক্ষুব্ধ। কারণ সব মিলিয়ে কমপক্ষে ভুট্টা চাষে হেক্টর প্রতি ২৫ হাজার টাকা খরচ। এরপর সব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ক্ষতিপূরণ পান না। কারণ অনেক ক্ষেতমজুর কৃষক তাদের সমস্ত কিছু বন্ধক রেখে পরের জমিতে চাষ করেন। সেক্ষেত্রে সরকার জমির মালিককেই ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। অথচ যে চাষ করল সে বঞ্চি তই থেকে যায়। ঘটনা সরকারের গোচরে থাকলেও আইনগত কারণে কিছুই করার থাকে না। আর জমির মালিক তো সাময়িক চাষের জন্য কোনও লিখিত চুক্তি করে না। এটা নাকি জমির মালিকের মর্যাদাহানির সামিল। কিন্তু যে চাষ করল তার ক্ষতির কোনও খবরই জমির মালিক রাখতে চায় না। এর ওপর দুর্নীতি-পরায়ণ আমলা ও কর্মীদের ফেরে পড়ে ক্ষতিপূরণের টাকা আদৌ আর ঘরে ঢোকে না অধিকাংশ কৃষকেরই।

২০০৬ সালেও মান্সান্টো ও কারগিল কোম্পানির বীজ কিনে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষি বিভাগ, কৃষি বিজ্ঞানী এবং কুখ্যাত বহুজাতীয় কোম্পানির অশুভ জোটের ফলস্বরূপ তাদের বীজ বাস্তবে কোনও পরীক্ষা না করেই বিক্রি করা হয়। কৃষি বিজ্ঞানীরা তাদের দায় এড়াতে কখনও সময়ের পূর্বে রোপণ, কখনও আবহাওয়ার কারণকেই দুষছেন। অথচ সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলি বীজের পরীক্ষার প্রতিবেদন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা কৃষি বিভাগের গোচরেই আনে না। মুজফ্ফরপুর জেলা কৃষি আধিকারিক বৈদ্যনাথ রজক জানিয়েছেন, কোম্পানিগুলি বীজ প্রয়োগের ফলাফলের কোনও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা না দিয়ে শুধুমাত্র লাইসেন্স থাকার অধিকারেই বাজারে অপরীক্ষিত বীজ বিক্রি করে দেয়। প্রশ্ন হলো, ঘটনা প্রকাশের পরও কৃষি দপ্তর সংশ্লিষ্ট কুখ্যাত কোম্পানির বিরুদ্ধে কেন কোনও আইনী ব্যবস্থা নেয় না? আসলে সবই পূর্ব পরিকল্পিত। কারণ দরিদ্র কৃষক যে আইনী লড়াই চালানোর মতো সম্পদশালী নয়, সেটা সরকারের পরিচালক রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভালরকমই জানা আছে। তাই এমন অবহেলা।

দেশের আর্থিক ভিত্তিই হল কৃষি। অথচ সরকার সবথেকে কম গুরুত্ব দেয় কৃষিকেই। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। বিহারের ৮১ শতাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর। ভারত বীজের এক বড় বাজার। বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে বাজারি লেনদেনও এখন খুবই সহজ হয়েছে। কালো তালিকাভুক্ত বেশ কয়েকটি মার্কিন বীজ কোম্পানি এই বাজার কব্জা করতে সবরকমের চেষ্টা করছে। মার্কিন এইসব কোম্পানি ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জমিগুলির ওপর তাদের কব্জা পাকা করছে। প্রাথমিক ভাবে এইসব কোম্পানি কৃষকদের ভারতের পরম্পরাগত বীজ ও কৃষি ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ করে তুলছে। বেশি বেশি উৎপাদনের লোভ দেখিয়ে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বা জিনগতভাবে উদ্ভাবিত বীজ ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছে। এদিকে পেটেন্টের কৌশলে কোম্পানিগুলি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। কয়েক বছর আগে বিটি কাপাস তুলোর চাষে অন্ধ্রপ্রদেশে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা আত্মহত্যা করেন। বিদর্ভসহ দক্ষিণ ভারতে কৃষকদের আত্মহত্যা এইসব কুখ্যাত কোম্পানি এবং স্থানীয় সরকারের অশুভ জোটের ফলেই ঘটেছিল। সম্প্রতি বিটি বেগুন নিয়েও একই খেলা শুরু হয়েছে। এতে

(এরপর ১৩ পাতায়)

তালিবানদের মদত দিচ্ছে আইএসআই

(১ পাতার পর)

মদত দিয়ে চলছেন”। এর পাশাপাশি ‘সানডে-টাইমস’-এ পৃথক একটি খরবে প্রকাশিত হয়েছে যে সম্প্রতি জারদারি স্বয়ং পাকিস্তানের একটি কারাগার পরিদর্শনে গিয়ে ৫০ জন উচ্চপদস্থ তালিবানী সদস্যের সঙ্গে মিলিত হন। এর পাঁচদিন পরে এই জেলবন্দী তালিবানদের কয়েকজনকে কোয়েটার কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। জারদারি তাদের মুক্তির আশ্বাসও দেন।” এই প্রতিবেদনের সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে লণ্ডন স্কুল অব্ ইকোনমিক্সের সমীক্ষায়। কারণ সেই সমীক্ষা বলছে—“উগ্র পন্থীদের মদত দেওয়ার পাশাপাশি পাক-নিরাপত্তাবাহিনী (ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স) বর্তমান আফগানিস্তানে ভারতের প্রভাব হ্রাস করতে চাইছে।” যদিও জারদারির মুখপাত্র, পাক-প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা গেছে তালিবানেদের সর্বোচ্চ ১৫ জন নেতার মধ্যে সাত জনই আই এস আই-এর এজেন্ট।

রাজীব গান্ধীকে আড়ালের চেষ্টা

(১ পাতার পর)

গত সাত বছরে অনেকবারই অ্যাণ্ডারসনকে প্রত্যর্পণের কথা আমেরিকাকে বলা হয়েছে। কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের বক্তব্য হলো—ভারত-মার্কিন প্রত্যর্পণ চুক্তি এবং আমেরিকার স্থানীয় আইন—এই দুইয়ের নিরীখেই অ্যাণ্ডারসনকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে হবে। কিন্তু ঘটনা হলো, ভারতের তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এখনও পর্যন্ত-এ ব্যাপারে অতিরিক্ত কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি। ভোপাল গ্যাস কাণ্ডের পর দীর্ঘ ২৬ বছর কেন্দ্রে ক্ষমতায় কংগ্রেস ছিল। অথচ গ্যাস কাণ্ডের অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সামান্য তৎপরতাও দেখায়নি। রাজীব গান্ধীর সবুজ সঙ্কেত ছাড়া এই জঘন্য অপরাধীর মুক্তি সম্ভব ছিল কি?

শাসক দলের কথাতেই চলছে যৌথবাহিনী

(১ পাতার পর)

জনজাতি সাঁওতাল মহিলার দুটি চোখ (ছিতামনি মুর্মু ও অন্য একজন) নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরই গঠিত হয় পুলিশী সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটি এবং লালগড় সন্নিহিত এলাকায় পুলিশ বয়কট। লালগড় থানার মেন গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল জনগণের কমিটি। পুলিশ তখন একেবারে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল। গত বৎসর ২০ জুন যৌথবাহিনী গিয়ে তালা খোলে এবং লালগড় থানা সক্রিয় হয়। জনগণের কমিটির দরজা দিয়েই মাওবাদীরা জঙ্গলমহলের জনগণের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রভাব বিস্তার করে। সেই প্রভাব দিন দিন বেড়েছে বই কমেনি। হাজার পাঁচেক যৌথবাহিনী, রোজ ৩০/৪০ লক্ষ টাকা খরচ সত্ত্বেও লালগড়ের দুই মূর্তিমান কমরেড অনুজ পাণ্ডে এবং জয়দেব গিরি নিজের ঘরে ফিরতে সাহস পাননি। অভিযোগ, ওরাই মেদিনীপুর শহর থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের (পুড়ুন ঝাড়খণ্ড পার্টি ও তৃণমূল) সমর্থক ক্যাডারদের গ্রেপ্তার ও অত্যাচার করতে যৌথবাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছে। এর ফলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার বদলে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। যৌথবাহিনী ও দলের পোষা হার্মাদদের দিয়ে বিরোধীদের টাইট করানো চলছে। যেমন, লালগড় লাগোয়া দুবরাজপুর গ্রামের ঝাড়খণ্ড পার্টির ক্যাডার সুকুমার মণ্ডলকে পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা গেছে কয়েকদিন বাদে আদালতে তোলা হলেও অভিযোগ জমা দেয়নি পুলিশ। এর পরও কি পুলিশকে মানবিক, সহানুভূতিশীল বলে মানতে হবে? এরকম ঘটনা এখন রাজ্যব্যাপী অজস্র সংখ্যায় ঘটে চলেছে।

সিপিএম-এর অন্দরমহলেই এখন প্রশ্ন উঠছে—৩৩ বছর লাগাতার ক্ষমতায় থাকার পরও পশ্চিমবঙ্গে জনজাতিরা হঠাৎ করে কেন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বছরকয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই অনাহারে মৃত্যুর খবর স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এবার দিল্লীতে সম্মেলন করে ‘আদিবাসী অধিকার জাতীয় মঞ্চ’ গড়তে উদ্যোগী হয়েছে। বৃন্দা কারাতকে জনজাতি-আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা উদ্ধারে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বছর আটেক আগে রাঁচীতে আদিবাসী অধিকার নিয়ে এক সর্বভারতীয় সম্মেলন করেছিল সিপিএম। সেই সম্মেলনে দলিল পেশ করেছিলেন দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত স্বয়ং। এখন আবার নাকি ওইরকম জাতীয় সম্মেলন হবে। সেজন্য শ্রীমতী কারাত রাজ্যে রাজ্যে সফরে নেমেছেন। তবে এই প্রচেষ্টায় কতটা সাফল্য পাবেন তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা, এক পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া জনজাতি অধ্যুষিত অন্যান্য রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি অথবা কংগ্রেস, ওড়িশায় বিজু জনতা দল।

যে সকল কথা এতদিন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সময় থেকে এরাজ্যের বিরোধী দলনেত্রী এবং একদা বামফ্রন্ট সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের মুখে শোনা যাচ্ছে তাই এবার সিপিএমও বলতে শুরু করেছে। তাদের অভিযোগ—এস ই জেড, খনি ও বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পের নামে আদিবাসী জনজাতিদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ২০০০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে প্রতিবছর ৫০ হাজার হেক্টর বনাঞ্চল অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। সিপিএম অভিযোগ জানিয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কেননা, দেশের জনজাতি এলাকার তপশিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ৫২টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৪টি কংগ্রেসের দখলে। এখন বুদ্ধু বাবুরা যৌথবাহিনী এবং ৩৩ বছরের নিজেদের কৃতকর্মকে আড়াল করতে জনজাতিদের স্বার্থ রক্ষার মঞ্চ গড়ছেন।

অর্জুন-ইউনিয়ান কার্বাইড

(১ পাতার পর)

আমার সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ এবং ১৯৭৫ থেকে ’৭৭—এই ক’টা বছর আমি যখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম তখন আমি একটা বিষয়ে বিস্মিত হতাম যে, কার্বাইডের আধিকারিকরা সরকারি আধিকারিকদের খুশি করার জন্যে এত সচেষ্ট কেন? আফটার অল, পেশাদারিত্ব আমাদের শিখিয়েছিল তারা তাদের কাজ করবে, আমরা আমাদের।” এতদিন পরে প্রশ্নটা উঠছে। অর্জুন সিং-এর আমলে নিজেদের কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি আদৌ সচেতন ছিলেন তো সরকারি আধিকারিকেরা? বোধহয় নয়। তাঁরা সচেতন থাকলে দুর্ঘটনার চেহারাটা মনে হয় এতটা মারাত্মক হোত না।

কার্যকর আইনের দাবী

(১ পাতার পর)

সরকার ব্যাপারটাকে কোনওরকম জোড়াতালি দিয়ে আনাড়ির মতো ম্যানেজ করেন। ভূপাল দুর্ঘটনার পর নতুন আইন হলেও তা প্রয়োগ ও মনিটর করার কাজটা ব্রাত্য থেকে গেছে।

আর এখন—নিম্নশ্রেণীর গোলমেলে যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র ব্যাপকহারে বিদেশ থেকে আমদানি করা চলছে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য। পরিবেশ সংক্রান্ত আইনকে সুচতুরভাবে পাশ কাটিয়ে আমদানি করা চলছে। আর যখন আদালতে মামলা হচ্ছে তখন যথেষ্ট দেরি যাচ্ছে আমদানি বন্ধ করতে। এভাবেই ভারতে ঢুকছে ক্ষতিকর ইলেকট্রনিক বর্জ্য, মার্কারি থার্মোমিটার, লেড (সীসা) এ্যাসিড ব্যাটারি। আবার বর্তমান কেন্দ্র সরকার আমেরিকা থেকে পারমাণবিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আমদানি করতে সব রকমের চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ সূত্রমতে ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড সে বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ জানে না। আইনমন্ত্রী বীরাপ্পা মৈলি নতুন আইনের আবশ্যকতা ব্যক্ত করেছেন।

ভারতের এখন দরকার—প্রচলিত আইনকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা। এমন এক স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যা সবরকম পক্ষপাতিত্ব অথবা ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করবে। নতুবা ভবিষ্যতে আরও ভূপাল কাণ্ড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

বিমান বসুর ডিগবাজি মুখে এলো মমতার কথার সাজি

নিশাকর সোম॥ যতদিন যাচ্ছে ততই প্রকট হচ্ছে সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদক তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর আবোল-তাবোল ভূমিকা। তিনি হঠাৎ মা-মাটি মানুষ বলে বক্তব্য পেশ করলেন। ঠিক এই সুযোগটাই লুফে নিয়ে তৃণমূল নেতা তথা বিধানসভায় বিরোধী নেতা পার্থ চ্যাটার্জি বললেন, "বিমানবাবুরা এতদিন উপহাস করার পর মমতার স্লোগান নিতে বাধ্য হলেন।"

বিমানবাবুর এই পরিবর্তন তাঁর পার্টির নিচের তলার কর্মীরা একটু অসুবিধায় পড়বেন। বিমানবাবুর এই পরিবর্তনের পিছনে কি বামফ্রন্টের সভায় সমালোচনা? কারণ বামফ্রন্টের প্রতিটি শরিক সিপিএম-পার্টি এবং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু এবং বিমানবাবুদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। বামফ্রন্টের সভার আগেই ফরওয়ার্ড ব্লক তাদের বক্তব্য প্রকাশ্যেই বলেছে। দলের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস বলেছেন, রাজ্যের সিপিএম নেতাদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরাজয়ের অন্যতম কারণ। সিপিএম সকল সময়েই দ্বিচারিতা করে থাকে। যে যে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা সিপিএম করে থাকে, সেইসব বিষয়ে রাজ্য-মন্ত্রিসভাও দ্বিচারিতা করে থাকে।

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর রাজ্য সাধারণ-সম্পাদক অশোক ঘোষ বুদ্ধবাবু সম্বন্ধে বলেছেন যে, আমরা ওরা বলে, অহঙ্কার করে সমস্ত কিছু নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মেট্রো-ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি-এর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুকে মাথা-নত করতে হয়েছিল!

অশোক ঘোষের ভূমিকা বড়ই মজার। একমুখে মমতাকে আমাদের নেত্রী বলেন, আবার বামফ্রন্টের সভায় বিমান বসুকে ধরে কেঁদে ফেলেন।

আজ জনগণ যে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে গেছে তা তো বামফ্রন্টের মন্ত্রিসভার কার্যকলাপেরই প্রতিক্রিয়া। ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রীদের কার্যকলাপের ফলেই জনসাধারণ কি বীতশ্রদ্ধ হয়নি? খাদ্য-সমবায় দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনার অবকাশ আছে। আর এস পি-র ক্ষিতি গোস্বামী পৌর নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপর্যয় সম্পর্কে বলেছেন, "রাজ্য-রাজনীতিতে পরিবর্তনের হাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই বহমান ছিল। এখন পরিবর্তন-এর দমকা হাওয়া উঠেছে—এটা ঠেকানো সম্ভব নয়।

মানুষ আর আমাদের চাইছে না। সাড়ে তিন দশক ধরে একই মুখ দেখ্‌তে জনগণের আর ভাল লাগছে না। বাস্তব অবস্থা বোঝার মানসিকতা চাই। ফলে নতুন মুখ চাই। ললাট লিখন খন্ডানো যাবে না।

বামফ্রন্টের শরিক সোসালিস্ট পার্টির অর্থাৎ কিরণময় নন্দর দলের অবলুপ্তি ঘটেছে। এই পার্টি মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে সমাজবাদী পার্টি নির্বাচনী ঐক্য সম্পর্কে যে নীতি নেবে তা এ-রাজেও প্রযোজ্য হবে।

সমাজবাদী পার্টি যদি কেন্দ্রীয়ভাবে ইউপিএ-এর সঙ্গে ঐক্য করে, এ-রাজ্যও তাই হবে। এমনকী মমতা'-র সঙ্গে ঐক্য করার কথাও বাতিল করা যায় না। এই কিরণময় নন্দই বলেছেন, তিনি লোকসভা নির্বাচনের পরই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার কথা বলেছিলেন। কিরণময় আরও বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই সরকার তো কোথায় গেছে! এখন তো জনগণ এই সরকার-এর ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছে। এখন সার্টিফিকেটটা শুধু হাতে ধরিয়ে দেবে। এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ধারণা ভুল।

ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি এবং সিপিআই বামফ্রন্টের সভায় একসঙ্গে সিপিএম-এর বিনয় কোঙার-কে চুপ করিয়ে দেন। বিনয় কোঙার বলছিলেন, অর্জুন সেনগুপ্তর রিপোর্ট— দেশে ৭৭ শতাংশ বিপিএল ভুক্ত। এটা নিয়ে আন্দোলন করা যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ ফরওয়ার্ড ব্লকের সাইরানি, আর এস পি-এর মনোজ ভট্টাচার্য এবং সিপিআই-এর স্বপন ব্যানার্জি বলে ওঠেন, "রাখুন মশাই আন্দোলন—আপনার সরকার তো বিপিএল তালিকাই ঠিক মতো করে উঠতে পারেনি।" বিনয় কোঙার নিরুত্তর হয়ে পড়েন। যে কথা এই কলামে লেখা হয়েছিল তা হয়েছে অর্থাৎ বামফ্রন্টে সিপিএম-কে আর কেউই মানছেন না।

ফরওয়ার্ড ব্লকের নির্বাচন এগিয়ে আনার তাগিদের কারণ হলো—তাদের নিচের তলার কর্মীদের দাবি—"এখুনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করুন।" এটা সামলাবার জন্য এই স্লোগান ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের।

কিরণময় নন্দ নির্বাচন এগিয়ে আনতে চান। কারণ তাঁরা অল ইন্ডিয়া পার্টির অংশ হিসাবে খুশিমতো চলতে পারবে। এখন বাধ্যবাধকতা থেকে যাচ্ছে, মোটকথা সিপিএম বস্তুত কোণঠাসা। এদিকে সিপিএম-এর হুগলী জেলা কমিটি ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটিতে পৌর নির্বাচনের পরাজয় নিয়ে নেতারা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মত্ত। হুগলীতে অনিল বসুর বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা উঠেছে। তেমনি উত্তর ২৪ পরগণার অমিতাভ নন্দী, রণজিৎ কুণ্ডু, তড়িৎ তোপদার-এর বিরুদ্ধে নিচের তলার কর্মীরা তোপ দাগছেন। সমস্ত জেলাতেই নেতৃত্বের পরিবর্তন না-হলে জেলা পার্টি বসে যাবেই।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল গার্ডেনরিচের কয়েকজন স্থানীয় সিপিএম-এর কর্মীর সঙ্গে কথা বলার। শুনলাম তাঁদের ক্ষোভ। তাঁদের ক্ষোভ গরীব কমরেডদের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়নি। বড়লোকের আত্মীয় স্বজনদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল। কিসের বিনিময়ে? এই বড়লোকরা ভোট দেয়নি। গরীব কর্মীরা না খেয়ে ভোটের কাজ করে, ভোট দিয়ে নিজেরা নিঃস্ব হয়ে গেছে। তারা আর এই কাজ করবে না। এই সেন্টিমেন্ট সর্বত্রই। সব গরীব কর্মীর কথা—নেতারা মন্ত্রীরা বড়লোকদের স্বার্থরক্ষা করে, তাদের ছেলে-মেয়েদের চাকরি দেয়।

এদিকে শরিকদের ঠাণ্ডা করার জন্য সিপিএম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর এস পি, সিপিআই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের কাছে কথা দিয়েছেন যে সিপিএম, কংগ্রেস-এর সঙ্গে আর যাবে না। কেন্দ্রীয় প্লেনামে এই কংগ্রেস সম্পর্কে একটি প্রস্তাব নেওয়া হবে। একথা বলেছেন সিপিএম-এর সাধারণ-সম্পাদক প্রকাশ কারাট। কংগ্রেস নিয়ে প্রকাশ কারাট এবং সীতারাম ইয়েচুরির মতবিরোধ শেষ হয়েছে। কারণ সীতারাম ইয়েচুরি নাকি ইউপিএ-এর মন্ত্রীদের নানা সুবিচারের জন্য চাপ দিতেন এবং হুমকি দিতেন সমর্থন তুলে নেব। এই কথা আলোচনায় আসার পর থেকেই সীতারাম চুপ করে কারাট-পন্থী হয়েছেন। সীতরামও পশ্চিমবঙ্গ পার্টির রাজ্য নেতৃত্বের তীব্র সমালোচক হয়ে পড়েছেন।

এছাড়া আর এস পি, সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় সি পি আই এম-এল (লিবারেশন)-কে বামফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সিপিএম-এর সাধারণ-সম্পাদক প্রকাশ কারাট বলেছেন। এ-ব্যাপারে প্লেনামের পরই তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর রাজ্য-নেতৃত্বকে বিশেষ করে বুদ্ধ ভট্টাচার্য, বিমান বসু-কে একজনও নিচের তলার কর্মী পছন্দ করছেন না। সমস্ত লোকাল কমিটি এদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছে। বুদ্ধ-নিরুপম-বিমান-বিনয়—এই 'গ্যাং অফ ফোর'কে দুষ্ট চতুষ্টয় বলে বর্ণনা করছেন সিপিএম-এর সাধারণ কর্মীরা এবং লোকাল কমিটির সদস্যগণ। সর্বশেষ বুদ্ধ-ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন, মদন তামাং-এর হত্যার পর দার্জিলিং-এ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথা পুলিশ এই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নেতা—মন্ত্রীদের দুর্নীতির ব্যাপারে পার্টির সর্বস্তরে আলোচনার ঢেউ উঠেছে। লক্ষ্মণ শেঠ তো একেবারে কোণঠাসা। দীপক সরকার এবং সুশান্ত ঘোষ-এর ব্যর্থতার জন্য সমালোচনা উঠেছে। এঁদের মারদাঙ্গা নীতির ফলেই পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরে সিপিএম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এই দুই নেতার অপসারণ চাইছেন দুই মেদিনীপুরের পার্টি কর্মীরা। যেমন সমালোচনা উঠেছে মুর্শিদাবাদের নৃপেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে। তাঁর নীতি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এই পটভূমিকায় বলা যায় এ-রাজ্যে সিপিএম বিধানসভার নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয়ের দিকেই এগিয়ে চলেছে। এটাই ভবিতব্য।

নেতা—মন্ত্রীদের দুর্নীতির ব্যাপারে পার্টির সর্বস্তরে আলোচনার ঢেউ উঠেছে। লক্ষ্মণ শেঠ তো একেবারে কোণঠাসা। দীপক সরকার এবং সুশান্ত ঘোষ-এর ব্যর্থতার জন্য সমালোচনা উঠেছে। এঁদের মারদাঙ্গা নীতির ফলেই পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরে সিপিএম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এই দুই নেতার অপসারণ চাইছেন দুই মেদিনীপুরের পার্টি কর্মীরা।

অ যাচ রকম

কালিদাসের উৎস সন্ধানে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অদ্ভুত অনুসন্ধান। প্রথম প্রথম এঁদের লক্ষ্য ছিল 'আন্তর্জাতিক ভারতীয়'দের উৎস খুঁজে বের করা।

পাটনায় এ এস আই-এর গবেষকরা।

'আন্তর্জাতিক ভারতীয়' মানে জন্মসূত্রে ভারতীয় কিন্তু কর্মসূত্রে আন্তর্জাতিক এমন ভারতীয় যেমন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়াম—এঁদের পরিবার-পরিজনদের উৎস অর্থাৎ 'অরিজিন' খুঁজে বার করা। বছর তিনেক আগে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার পাটনা ডিভিসনের জনা ষাটেক গবেষক একত্রিত হয়েছিলেন। কবি কালিদাসের জন্মস্থান খোঁজার শপথ নিয়েই সেদিন এক হয়েছিলেন তাঁরা। কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল মহাকবি কালিদাসের জন্ম-বৃত্তান্ত যেভাবে রহস্যের মোড়কে ঘেরা রয়েছে, তা উন্মোচন করা দরকার। এই অনুসন্ধানকারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'পথ-নির্দেশ' দিয়েছিলেন আর্কিওলজি বিভাগের ডঃ ফণীকান্ত মিশ্র। তিনি মধুবনী-দ্বারভাঙ্গা এলাকায় খননকার্য চালানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেইমতো অনুসন্ধান চালানো হয় ওই এলাকায়। আর তাতেই চমক। উচাইথ এলাকায় এমন কিছু নির্দশন মেলে যাতে ওই এলাকাটিকে কালিদাসের জন্মস্থান ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যদিও বিহার ধর্ম-পরিষদের অছি-পর্ষদের সদস্য এবং সংস্কৃত পণ্ডিত কিশোর কুনাল এই তত্ত্ব মানতে নারাজ। কারণ তাঁর মনে হচ্ছে কালিদাসের জন্মস্থান খননকার্যের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া সম্ভবপর নয়। কিশোর কুনালের বক্তব্য—"কালিদাসের জন্মস্থান হিসেবে মিথিলার যে নাম রয়েছে, তা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যেহেতু 'বিম-ফালা' বলে কালিদাস বর্ণিত এক ধরনের ফলের নিদর্শন পাওয়া গেছে ওই অঞ্চলে। আবার বাঙালী গবেষকদের মতে কালিদাসের জন্মস্থান বঙ্গদেশেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু তাঁর নাম ও পদবী (কালিদাস) একজন বাঙালীরই মতো। প্রসঙ্গত, কালিদাস রিসার্চ কমিটি নামে মহাকবি কালিদাস ভক্তদের যে সমিতিটি গড়ে উঠেছিল তারা বর্তমানে সূচনা করেছে বার্ষিক কালিদাস উৎসবের। তাঁদের মতে কালিদাসের জন্মস্থান আসলে মুর্শিদাবাদের গাড্ডা সিঙ্গরু গ্রাম। আবার কাশ্মীরি পণ্ডিতরা 'কুমারসম্ভব' ও 'মেঘদূত' কাব্যগ্রন্থ উদ্ধৃত করে বলছেন—এতে হিমালয়ের যে বর্ণনা দেওয়া রয়েছে, তার সঙ্গে কাশ্মীরের অনেকটা মিল রয়েছে। বিক্রমাদিত্য (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত)-এর সভায় মহাকবি কালিদাসের অস্তিত্ব ছিল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায়। সেই সূত্র ধরে উজ্জয়িনীকেও তাঁর সম্ভাব্য জন্মস্থান হিসেবে ধরা হচ্ছে। আবার উড়িষ্যার পণ্ডিতরা মনে করছেন তাঁর জন্ম উড়িষ্যার রামাগিরিতে। 'মেঘদূতম্' পড়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে অনেকের আবার ধারণা মহারাষ্ট্রের নাগপুরের কাছে রামটেকে জন্ম কালিদাসের।

বিচার-বিশ্লেষণ চলুক। পাঠক অধীর আগ্রহে কালিদাসের প্রকৃত জন্মস্থানের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকবে। 'নেই তাই খাচ্ছো, থাকলে কোথায় পেতে, কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।' তাঁর জন্ম এই হিন্দুস্থানেই, কোথাও না কোথাও।

বাংলাদেশে জে এম বি আবারও সক্রিয়

সংবাদদাতা।। জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জে এম বি) বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন। এই সংগঠনের জন্ম ১৯৯৮ সালে উত্তর বাংলাদেশের জামালপুর জেলায়। এই সংগঠনের গঠনতন্ত্রে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা আছে—'আমরা আল্লার সেনানী। আমরা আল্লার শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি। যে পথে মহম্মদ, সাহেবী এবং বীর মুজাহিদিনরা বহু শতাব্দী ধরে অগ্রসর হয়েছে।....এখন সময় এসে গেছে বাংলাদেশে ইসলামি আইন বলবৎ করার। মনুষ্য নির্মিত আইনের এখানে কোন স্থান নেই।'

তাদের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা বাংলাদেশে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ বিস্তারে নজর দেয়, তাদের এই সব কাজে তারা আর্থিক সহায়তা পেতে থাকে কুয়েত, বাহারিন, পাকিস্তান, সৌদি আরব, লিবিয়া প্রমুখ রাষ্ট্র থেকে। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পর জে এম বি-র কার্যকলাপ এক বিশেষ মাত্রা পায়। ২০০৫ সালে তারা বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ভিতর ৬৩টি জেলাতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এরপরই বিশ্বজুড়ে এই জঙ্গি সংগঠনকে নিয়ে হইচই শুরু হয়। জানা যায় ইতিমধ্যেই তারা বাংলাদেশ ৭০০টি মসজিদ স্থাপন করেছে। জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়েছে ১০ হাজার পূর্ণকালীন এবং ১০ হাজার আংশিক সময়ের কর্মীদের। যাদের ভিতর বহু কর্মীই হাত বোমা, ডেটনেটর, পেট্রোল বোমা এমন কী আর ডি এক্স বোমা তৈরি করতেও সক্ষম। আন্তর্জাতিক চাপে শেষ পর্যন্ত জে এম বি-র বহু গুরুত্বপূর্ণ নেতা গ্রেপ্তার হন। অবশেষে ২০০৭ সালের ৩০ মার্চ দলের সুপ্রিম কমাণ্ডার মৌলানা আব্দুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই সহ ছয় জন মৌলাবাদীর ফাঁসি হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে।

এরপর থেকে বাংলাদেশে জে এম বি-র কার্যকলাপ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হলেও আণ্ডারগ্রাউন্ডে তারা যথেষ্ট সক্রিয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তারই উদাহরণ হিসাবে এ বছরের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ৫ জানুয়ারি জে এম বি-র এক জন সক্রিয় হইসার (পূর্ণকালীন কর্মী) ইউসুফ আলীকে র‍্যাব (র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান) গ্রেপ্তার করে। আমিজল হক বাবু (৩৮) গ্রেপ্তার হন ২২ এপ্রিল। এঁরা দুজনেই গ্রেপ্তার হন চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা থেকে। ৩ মে নওগাঁও জেলা থেকে এ টি এম আলি (৫০), জামালুদ্দিন (২৬) গ্রেপ্তার হন, ১০ মে ময়মনসিং জেলা থেকে আব্দুল হান্নান (২৩), মহম্মদ তুয়েল (২৫)-কে র‍্যাব গ্রেপ্তার করে। ১৫ মে বাংলাভাই-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিপ্লব নাটোর থেকে গ্রেপ্তার হয়। ১৮ মে র‍্যাব কিশোরীগঞ্জ জেলা থেকে আরও ৫ জে এম বি জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশে কোনও না কোনও নাশকতামূলক কার্যকলাপ রূপদানের চেষ্টায় ছিল।

এরপর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে গত ২৪ মে। ঢাকার পূর্ব দনিয়া থেকে বাংলাদেশের বিশেষ গোয়েন্দা দল জে এম বি-র বর্তমান আমির সাইদুর রহমানসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সিদ্ধি রগঞ্জের পাইনাদিতে একটি বড় জঙ্গি ঘাঁটির খোঁজ মেলে। এই আস্তানা থেকে আরও দুই জঙ্গি গ্রেপ্তার, আর ডি এক্স বোমা তৈরির বিপুল সরঞ্জামসহ আত্মঘাতী

হামলায় ব্যবহারযোগ্য ১০টি কোমরবন্ধনী উদ্ধার হয়। ওই আস্তানায় গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গি আমির হোসেন ওরফে শরীফ পুলিশকে জানায় যে, জে এম বি প্রধান তাদের ৪০টি সুইসাইড ভেস্ট তৈরি করতে বলেছিল। প্রাপ্ত সুইসাইড ভেস্টের মধ্যে লাগানো একটি বোমা এতই শক্তিশালী ছিল, যে তার দ্বারা একটি বৃহৎ বাড়িকেও উড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর। ২৪ মে ঢাকার দক্ষিণ দনিয়ার অপর একটি ডেরাতে হানা দিয়ে সহকারী পুলিশ কমিশনার (এ সি) ছানোয়ার হোসেন আকারে ছোট কিন্তু অতিশক্তিশালী ৯টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রানুসারে এই প্রকৃতির বোমা পাকিস্তান, আফগানিস্তানের মুজাহিদিন জঙ্গিরা ব্যবহার করে থাকে। তাই তাদের ধারণা সাম্প্রতিক সময়ে জে এম বি-র কেউ ওইসব দেশে গিয়ে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অথবা সেখান থেকে কোনও প্রশিক্ষক এদেশে এসেছিলেন।

পুলিশ সূত্র থেকে আরও জানা গেছে জে এম বি আর ডি এক্স ছাড়াও স্থানীয় ভাবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম ক্লোরেট, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, সালফার, ইউরিয়া, আকন্দ গাছের ছাল প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যেও বিভিন্ন প্রকার দেশী অথচ শক্তিশালী বোমা তৈরি করছে।

বর্তমানে জে এম বি-র গ্রেপ্তার হওয়া আমির তথা কুখ্যাত জঙ্গি সাইদুর রহমানকে টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টি এফ আই) সেন্টারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সূত্র অনুসারে সাইদুর ইতিমধ্যেই বহু চাঞ্চ ল্যকর তথ্য ফাঁস করেছে। জে এম বি-র সঙ্গে পাকিস্তান, আই এস আই-এর সম্পর্ক সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। ভারতীয় ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের মাটি তথা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও আত্মঘাতী জঙ্গি হানার কিছু পরিকল্পনা ছিল জে এম বি-র— একথাও ঢাকার এক সূত্র উল্লেখ করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, জে এম বি রকেট লঞ্চ ার তৈরির কৌশল আয়ত্ব করেছে। ইতিমধ্যেই তিনটি রকেট-লঞ্চ ারের সফল পরীক্ষা হয়েছে সুন্দরবনের বড়গুণায়। ধৃত জে এম বি জঙ্গি পুলিশের জেরায় জানিয়েছে, তাদের এই মুহূর্তে আত্মঘাতী জঙ্গি সংখ্যা ২৫ এবং আর ডি এক্স বোমা তৈরির কারিগর আছেন ৫০ জনের মতো।

বর্তমানে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের জঙ্গি রা এবং আই এস আই বাংলাদেশে বর্তমান শান্তির বাতাবরণ নষ্ট করার জন্য মরিয়া। তার জন্যই তাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আত্মঘাতী হামলার দ্বারা বাংলাদেশের শান্তিকামী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘু নেতৃত্ব, তথা ভারতের সীমান্তবর্তী কিছু স্থানে হামলা করা তাদের লক্ষ্য। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার সেদেশের জেহাদী জঙ্গি বিষয়ে আগের থেকে তুলনামূলক কঠোর থাকায় তারা সে ধরনের বড় ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে ঘটাতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তারা যে থেমে নেই ঢাকা থেকে সাম্প্রতিক বিপুল অস্ত্র, বোমা উদ্ধারেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাই বর্তমানে ভারত সরকারকেও নিজ স্বার্থে এ বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে।

রায়গঞ্জে ৫১ জোড়া বনবাসী যুবক-যুবতীর মালাবদল

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ দরিদ্র পরিবারের বনবাসী প্রেমিক-প্রেমিকেরা সাত বছর পরে এমন ভাবে যে সামাজিক স্বীকৃতি পাবেন, ভাবতে পারেনি। আবার কেউ সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে পুরোদস্তুর সংসার ঘরকন্না সবই করেছেন, দুই তিনটি সন্তানও আছে। অথচ ওদের এমন কোনও সামর্থ্য ছিল না যে বিয়ের পর প্রথা মেনে প্রতিবেশীদের ভোজ খাওয়াবে। তাই এতদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসার স্বপ্ন তাদের অধরাই থেকে গেছে। গত ৮ জুন মঙ্গলবার তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হলো উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর সারদা বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণে। ৫১ জোড়া বনবাসী যুবক যুবতী এই দিনে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে রাঙা চেলি আর শোলার টোপর পরে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন। এই গণবিবাহের আসরে মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ওই সব বনবাসী পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এইদিন সকালে প্রায় তিন হাজার বনবাসী রমণী রায়গঞ্জ শহর থেকে তিন কিমি দূরে কুলিক নদী থেকে জলভরে মঙ্গল কলস নিয়ে মাদল ও ধামসা বাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। পায়ে হেঁটে বনবাসী ঐতিহ্য মেনে তারা বিদ্যালয়ে আসন। এরপর ১০ জন পুরোহিত দুপুর ১১টাতে উপস্থিত থেকে মালা বদল হলো ৫১ জোড়া দম্পতির। হাজার তিনেক বনবাসীর খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে প্রত্যেককে দেওয়া হয় তিন হাজার পাঁচশত টাকার উপহার সামগ্রী। একটি ট্রাঙ্ক ভর্তি সিটি গোল্ডের গহনা, শাড়ি, ধুতি, জুতো উপহার পেয়ে বেজায় খুশি নব দম্পতিরা। কারিয়া মর্মু ও ধমরী টুডুদের মতো অন্য সব নব দম্পতিদেরও চোখে মুখে ফুটে উঠছিল খুশির ঝলক। তাদের দিকে তাকিয়ে বোঝা যাচ্ছিল এই মুহূর্তে তারা পৃথিবীর সব চেয়ে সুখী দম্পতি। আজ এই গণবিবাহের আসরে বিয়ে করে ও ভোজ খেয়ে তারা প্রত্যেকেই খুশিতে ডগমগ। গণবিবাহ আসরে উপস্থিত ছিলেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সহ খেলকুদ প্রমুখ শক্তিপদ ঠাকুর, ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের উত্তরবঙ্গের সভাপতি রাজেন লাহিড়ী, শ্রীমতি রেখা হেমরম (গুরুমা), গঙ্গাপ্রসাদ মুর্মু ও ধর্মজাগরণের পর্যবেক্ষক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার প্রমুখ। এতদিন দারিদ্র্যের কারণে আনুষ্ঠানিক ভাবে এইসব বনবাসী পরিবার বিয়ে করতে পারেননি। এই গণ বিবাহের মাধ্যমে হিন্দু রীতি মেনেই তারা সামাজিক স্বীকৃতি পেল। আগামী বছরও এমন গণবিবাহের আসর আবার বসবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

সহায় প্রকল্প চালু হয়নি কালচিনিতে

সংবাদদাতা।। জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকে আজও চালু হয়নি সহায় প্রকল্প। দুঃস্থ, অসহায় মানুষের জন্য রাজ্য সরকার এক বছর আগে সহায় প্রকল্প চালু করে। কালচিনি ব্লকে এই প্রকল্প চালু হয়নি এখনও। ফলে কয়েক হাজার দুস্থ মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চি ত হচ্ছেন।

অনেক জেলায় গ্রাম পঞ্চ ায়েতগুলিতে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। যেসব অসহায় মানুষ চিকিৎসা করার মতো ক্ষমতা নেই, তাদের সরকারি হাসপাতালে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া, যে ব্যক্তির কাজের যোগাড় করার ক্ষমতা নেই, তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা প্রভৃতি হলো সহায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

সহায় প্রকল্পের অধীন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ১০ টাকা করে। তবে ১০ টাকা যথেষ্ট নয় বলে অনেক গ্রাম পঞ্চ ায়েত সদস্য ও প্রধানরা অভিযোগ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কালচিনি ব্লকের বিডিও রাজেন্দ্ররাজ সুনদাস জানান, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে টাকা বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছে। কালচিনি ব্লকে খুব শীঘ্রই সহায় প্রকল্প চালু করার চেষ্টা চলছে।

মালদার কালিয়াচকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মালদা জেলার কালিয়াচক যে মুসলিম জেহাদী-দুষ্কৃতীদের ডেরা এবং তারা সেখানে ব্যাপকমাত্রায় বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্র জমা করছে এই খবর অনেক পুরনো এবং গা-সওয়া হয়ে গেছে। এবার গত ৯ জুন গভীর রাত্রে আরও একবার তা প্রমাণিত হলো।

সেদিন মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। কালিয়াচকের এক ব্যবসায়ীর গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করে। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে ওই বিস্ফোরক মজুতের খবর পায় পুলিশ। ১৭টি বস্তা ভর্তি ওই বিস্ফোরকের পরিমাণ প্রায় সাড়ে চারশো কেজির মতো। গোডাউনের মালিক চাঁদরতন দাগা এবং তার পুত্র বিক্রম দাগাসহ অন্য দুজনকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর। অন্য দুজনের একজনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে। প্রসঙ্গ ত, বছরখানেক আগে মুর্শিদাবাদ থেকে দুজন লস্কর এ তৈবা'র জেহাদি গ্রেপ্তার হয়েছিল। পুলিশী অভিযানে নেতৃত্ব দেন—মালদা জেলার ডি এস পি (আইন শৃঙ্খলা) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও আনন্দ রায়। মালদহের পুলিশ সুপার ভুবনচন্দ্র মণ্ডল বলেছেন, যে পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে, তা দিয়ে হাজারখানেক অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা বানানো সম্ভব। কারা কি উদ্দেশ্যে কালিয়াচকের ওই দাগা ব্যবসায়ীর গোডাউনে এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত করেছিল—সে ব্যাপারে এখনও ধন্দ রয়েছে। তবে কালিয়াচকে যে জেহাদিদের রমরমা তা কারও অজানা নয়। আবার জেহাদি মাওবাদী যোগাযোগের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কেননা উভয়েই প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে বিস্ফোরণ ঘটায়—অন্তত অভিজ্ঞতা তাই বলে। মাওবাদীরা ওই ধরনের মালমসলা থেকে বিস্ফোরক তৈরিতে বেশ দড়। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের সূতি থানার ঔরঙ্গাবাদ থেকে পুলিশ জনৈক নূর ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছিল। সে-ই নাকি জেরার মুখে ওই দাগাবাবুর গোডাউনের সন্ধানটা দিয়েছিল। চাঁদরতন দাগা ও তার ছেলের সঙ্গে কাদের ওঠা-বসা ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত বলা যায়, শুধু কালিয়াগঞ্জ কেন, খোদ কলকাতাতেও এরকম বহু বাড়িতে গোডাউন রয়েছে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর-এ গভীর রাত্রে বটতলা থানার ঠিক উল্টোদিকের বাড়িতে ব্যাপক বিস্ফোরণ হয়েছিল। সেটাও গ্যাস সিলিন্ডার জাত বলে বাজারে চালানো হয়েছিল। এবার কালিয়াচকের গোডাউনে পুলিশ তদন্ত ও মামলা কতদূর এগোয় বা চাপা পড়ে তা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে।

পৃথিবীর উলট্-পুরাণ

ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের সীমা বৃদ্ধি পেয়েছে গুজরাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'ধরিত্রী মা-এর কাছ থেকে কিছু পেতে হলে, তাঁকে তোমায় কিছু দিতে হবে। যদি তুমি না দাও, তবে তিনিও তোমায় কিছু দেবেন না। কারণ এই দেওয়া-নেওয়াটা একচক্রী (ওয়ান ওয়ে সাইকেল) নয়।' এহেন বক্তব্যটি কোনও ধর্মগুরুর নয়, কোনও সমাজতত্ত্ববিদের নয়, কোনও বুদ্ধি জীবীর নয়, কোনও অর্থনীতিবিদের নয়, কোনও অধ্যাপকেরও নয়। বক্তব্যটি এক রাজনীতিবিদের। 'আমরা-ওরা' ওয়ালা কোনও রাজনীতিবিদ নয়। নিতান্তই এক 'আমাদের' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। বলাই বাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রীটির নাম নরেন্দ্র মোদী।

উপরিউক্ত বক্তব্যটির প্রেক্ষিত হলো ভূগর্ভস্থ জল। শুধু ভারতবর্ষই নয়, বিশ্বজুড়ে ভূ-নিম্নস্থ জলের সীমারেখা ক্রমশ নামছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামীদিনে জাতি-দাঙ্গার থেকেও জল নিয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা হতে পারে। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ কিংবা উত্তরাখণ্ডের বুন্দেলখণ্ডের জলের অভাবে চাষ করতে না পারায় কৃষকের আত্মহত্যা এখন স্বাভাবিক ঘটনা। গ্রামীণ এলাকাকে বাদ দিলে যেসব শহরাঞ্চল গড়ে উঠছে যেমন দিল্লীর গুরগাঁও, কলকাতার রাজারহাট নিউটাউন ইত্যাদি সেখানে ভূ-নিম্নস্থ জলের অবস্থা আরও মারাত্মক। হায়দরাবাদের মতো মেট্রো শহরগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। শুধু খরার মরসুমেই নয়, সাধারণ মরসুমেও ভূ-নিম্নস্থ জলস্তরের সীমারেখা বেশ নেমে যায় বলে পানীয় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। এই পর্বত প্রমাণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া গুজরাত সরকার একাধিক প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে ভূ-নিম্নস্থ জলস্তরের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছেন, আর তাতেই নরেন্দ্র মোদীর এহেন উপলব্ধি হয়েছে। ২০০৪ সাল নাগাদ গুজরাটে ২২৫টি মহকুমার মধ্যে ১১২টি মহকুমায় ভূ-গর্ভস্থ জলের স্থিতি 'সেমি ক্রিটিক্যাল' থেকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু গত বছর একটি স্যাটেলাইট-কেন্দ্রিক সমীক্ষায় সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড (সি জি ডব্লু বি)-এর পর্যবেক্ষকরা দেখেন ওই ১১২টি মহকুমার মধ্যে ৬০র ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের সীমা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলের স্বাভাবিক জলস্তরের থেকে এই সীমা বৃদ্ধিও পেয়েছে। মূলত সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছের মহকুমাগুলোতেই জলস্তরের এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আসলে ওই দুটি এলাকায় গুজরাত সরকার ও সাধারণ মানুষের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয় স্বতন্ত্র পরীক্ষিত জলাধার বিপ্লব (ইউনিক চেক ড্যাম রেভোলিউশন)। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই সৌরাষ্ট্রের একটা বড় অংশে জল আসতে থাকে ট্রেন ও ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে। মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাটের মতো জল-প্রাচুর্য এলাকা থেকে আসত জল। পরিস্থিতি এখন আমূল পাল্টে গেছে। আগে গরমের সময় স্থানীয় পুকুর ও ডোবাগুলোকে হাজার খুঁড়লেও একঘটি জলের সন্ধান মিলত না। এখন সেখানকার অধিকাংশ গ্রামের কৃষকরাই জলের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে পেরেছেন। সময়মতো বর্ষা না এলেও তাদের চাষ এখন আটকায় না। খরার মরসুমেও মোটামুটি যোগান থাকে জলের। এক দশক আগেও এই কথা কেউ ভাবতে পারত না।

২০০১ সালে নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার পর ১ লক্ষ পাঁচ হাজার নিয়ন্ত্রিত জলাধার তৈরি হয়েছে ১,৪৮০ কোটি টাকার বিনিময়ে। তবে এর সব কৃতিত্বটাই কিন্তু গুজরাত সরকারের নয়। এতে অংশীদারিত্ব রয়েছে গুজরাটের জনগণেরও। এই জলাধারগুলো গড়ে তুলতে গ্রামবাসীরা বিনা মজুরীতে শ্রম দান করেছিল। তাতে করে সরকারের মজুরী খাতে পুরো খরচের অন্তত ১০ থেকে ১৫ শতাংশ টাকা বেঁচে যায়। এই নিয়ন্ত্রিত জলাধার প্রকল্পের পদ্ধতিটা এমন কিছু জটিল নয়। গ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে কোথাও নিয়ন্ত্রণ জলাধারের জন্য সুপারিশ করা হলে প্রথমে পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা স্থান নির্বাচন করবেন। স্থান নির্বাচনের পর ওই নিয়ন্ত্রিত জলাধারের জন্য তারা ছ'টি টেকনিক্যাল ডিজাইন গ্রাম কমিটিকে দেখিয়ে যে কোনও একটি বাছতে বলবেন। গ্রাম কমিটি যে নকশাটিকে পছন্দ করবেন তা চূড়ান্ত করতে পাঠানো হবে সরকারি দপ্তরে। এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক (জিওলজিক্যাল) পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সরকার তার অনুমতি দেবেন। তবে সরকারি অনুমতি আসার অব্যবহিত পরে তহবিল মঞ্জুর হোত এবং কাজও শুরু হয়ে যেত।

> **২০০৩ সাল নাগাদ গুজরাত সরকার 'গুজরাত সবুজ বিপ্লব আন্দোলনে'র সূচনা করেন। সরকারের লক্ষ্য ছিল ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের সীমা বৃদ্ধি করা। সরকারের এই কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে কৃষকেরা। মাঠের পর মাঠ সবুজ ঘাসে ভরিয়ে দেওয়া হয়। কুয়ো কিংবা নলকূপের জলের ওপর ভরসা রেখেই বছরভর জলের চাহিদা মিটিয়েছিল সেখানকার মানুষ।**

নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের ক্ষমতায় আসার পরেই কিন্তু শিল্পায়নের বিষয়টাকে ফোকাস করেননি। কারণ ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যাপারে তিনি আগাগোড়াই সচেতন ছিলেন। তখন গুজরাটে একদিকে চলছে পানীয় জলের নিদারুণ সংকট, অন্যদিকে শিল্পের প্রয়োজনে একমাত্র বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে তবেই জল পাওয়া যেত। বছরের অন্য সময়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হোত। এর ফলে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন একপ্রকার বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছিল। মোদী এসেই উত্তর ও মধ্য গুজরাটের এলাকাগুলিতে খামার-পুকুর গড়তে শুরু করলেন। যদিও কাজটা খুব একটা সোজা ছিল না। ১৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ কোটি ৮১ লক্ষ খামার-পুকুর গড়লেন তিনি। প্রসঙ্গত, খামার-পুকুরের অস্তিত্ব খামার সংলগ্ন। মূলত বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্যই এই পুকুরটির প্রয়োজন পড়ে। এর ফলে জলের প্রাকৃতিক উৎসকে যেমন সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় অন্যদিকে শিল্পের প্রয়োজনে জলের চাহিদাও মেটানো যায়।

২০০৩ সাল নাগাদ গুজরাত সরকার 'গুজরাত সবুজ বিপ্লব আন্দোলনে'র সূচনা করেন। সরকারের লক্ষ্য ছিল ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের সীমা বৃদ্ধি করা। সরকারের এই কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে কৃষকেরা। মাঠের পর মাঠ সবুজ ঘাসে ভরিয়ে দেওয়া হয়। কুয়ো কিংবা নলকূপের জলের ওপর ভরসা রেখেই বছরভর জলের চাহিদা মিটিয়েছিল সেখানকার মানুষ। প্রথমত, ভূগর্ভস্থ জল-কে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ব্যবহার করা এবং সবুজায়ন বছরখানেকের মধ্যে সেই জলস্তর বৃদ্ধি করেছিল। সেইসঙ্গে সরকারের পূর্ত দফতরের কিছু প্রকল্পও জলস্তর বৃদ্ধি তে সহায়তা করেছিল। উদাহরণ একটা দেওয়া যেতেই পারে। উত্তর এবং মধ্য গুজরাতে যে কর্দমাক্ত খালগুলো রয়েছে, পূর্ত দফতর সেগুলো পরিষ্কারের জন্য সুজলাম্ সুফলাম্ যোজনা গ্রহণ করেছিল। এর ফলে খালগুলো পরিষ্কার তো হয়েইছে উপরন্তু জলস্তরেরও উন্নতি হয়েছে। পাইপলাইনের মাধ্যমে উত্তর গুজরাতের জলাধারগুলোতে কানাডা ক্যানাল থেকে জল পৌঁছে দেবার পরিকল্পনাটা পূর্ত দফতরেরই। উত্তর গুজরাতে ২১টি নদীকে নিয়ে একটি সীমাহীন খাল এবং দু'লক্ষ খামার-পুকুর গড়া হয় পূর্ত দফতরের উদ্যোগে। একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ২ কোটি টাকা খরচ করে ৪০টি খুব বড় আকারের নিয়ন্ত্রণ জলাধার তৈরি করে সরকার। যার নিট ফল ভূ-নিম্নস্থ জলস্তরের বৃদ্ধি। শুধু বড়সড় প্রকল্পই নয়, খরার মরসুমে একাধিক ছোট প্রকল্পেও হাত দিয়েছিল গুজরাত পূর্ত দফতর। ২০০৯ সালে গুজরাতে কৃষি-বৃদ্ধি (এগ্রিকালচারাল গ্রোথ)-র হার যেখানে ছিল ৯.০৬ শতাংশ সেখানে জাতীয় কৃষি-বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল তখন ৬.০৬ শতাংশ। গত দশ বছরে গুজরাতে কৃষি-জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ শতাংশ। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ১৮০০০ কোটি টাকা থেকে একলাফে বেড়ে ৪৯০০০ কোটি টাকা হয়েছে। হেক্টর প্রতি কার্পাস তুলো উৎপাদনের পরিমাণও প্রায় ছ'গুণ বেড়েছে, প্রতি হেক্টর ১৭৫ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৮ কোটি হয়েছে। এই বিপুল বৃদ্ধি 'বিশ্বরেকর্ড' করেছে। কারণ সারা পৃথিবীর গড় সেখানে হেক্টর প্রতি ৭৮৭ কেজি।

'লক্ষ্য' হিন্দু ভোট, 'টার্গেট' তাই আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ হিন্দুদের ভোট কব্জা করতে না পারলে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যে তাদের ভরাডুবি অনিবার্য, এটা বুঝেই আর এস এসের স্বয়ংসেবকদের ওপর পরিকল্পিত হামলা চালাচ্ছে সিপিএমের গুন্ডারা। যদিও স্বয়ংসেবকদের ওপর সিপিএমের হামলা—কেরল সরকারের মদতে আকছারই ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামে যখন রাজ্য সরকারের মদতে পরিকল্পিত হত্যালীলা সম্পন্ন হচ্ছিল, ঠিক একই সময় কেরলবাসীও অনুরূপ ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল। তখন সিপিএমের মুসলিম ভোটের একটা তাগিদ ছিল কেরলে। কিন্তু গত নির্বাচনের পর আচমকাই পাল্টে গেছে পরিস্থিতিটা। হিন্দু ভোট না পেলে বিশেষ সুবিধা হবে না বুঝেই 'পাইয়ে দেবার' রাজনীতিতে নেমেছে সিপিএম। কিন্তু এরাজ্যে বাম জমানার মতো কেরলেও সিপিএমের সুদীর্ঘ সময় ধরে অত্যাচারে হিন্দু জনগণের ভবী আর কিছুতেই ভুলছে না। সিপিএম তাই তাদের চিরাচরিত ট্র্যাডিশন মেনে হিন্দু সমাজকে বিভাজনের খেলায় মেতেছে। এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় বাধা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তাই স্বয়ংসেবকদের নিকেশ করার কাজটাও সিপিএমের গুন্ডারা শুরু করে দিয়েছে। গত ২৮ মে, ছোটবেলা থেকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এবং বর্তমানে একজন

অচ্যুতানন্দন

বিজয়ন

ডাকসাইটে বিজেপি কর্মী কে ভিজিথ এবং কে ভি সিনোজ বাইকে করে যাচ্ছিল। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ যখন তারা থালাসেরির নিউ মাহে-তে পৌঁছোয়, তখন সিপিএমের জনা-পাঁচেক দুষ্কৃতী তাদের ওপর পেটো (বোমা) ছোঁড়ে। পেটোতে ভিজিথ এবং সিনোজ ধরাশায়ী হবার পর তাদের ছুরি দিয়ে কোপানো হয়। তাদেরকে কোঝিকোড় হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ভিজিথের বয়স ত্রিশ, সিনোজের বত্রিশ।

এই ঘটনার তদন্তে কেরল পুলিশ নিস্পৃহ। জনৈক পথচারী সুজিত পুরো ঘটনার সাক্ষী। পুলিশ তাকে কেবলমাত্র 'জিজ্ঞাসাবাদ' করেই ছেড়ে দিয়েছে। এই ঘটনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন এবং কেরলে সিপিএমের সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের মধ্যে যতই আকচা-আকচি থাক না কেন, তাদের অভ্যন্তরীণ গন্ডোগোল থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য আর এস এসের ওপর আক্রমণকেই বেছে নিয়েছেন তাঁরা।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে, রাজ্যে মুসলিম তোষণ নিয়ে পার্টি লাইন বদল হতে পারে কিন্তু মৌলবাদী জেহাদি সংগঠন যেমন এন ডি এফ, সিমি ইত্যাদির সঙ্গে পার্টির কিছু লোকের এখনও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এই যোগসাজশের পরিণামেও এহেন খুন হতে পারে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

রাজ্য সরকার ও মাদ্রাসা শিক্ষা

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি কয়েকটা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতের কাছে এসেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, এই সরকার অত্যন্ত আগ্রহ ও ব্যগ্রতার সঙ্গে মাদ্রাসা-শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করে চলেছে। শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী কাজ, কিন্তু উৎসাহের মাত্রাটা মনে হয় একটা সীমার মধ্যে রাখা দরকার ছিল।

এই ব্যাপারে কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, মাদ্রাসা শিক্ষাসূচীতে কিছুটা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন আনার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য কিছুকাল আগে বলেছিলেন, মাদ্রাসা-শিক্ষার পাঠক্রমে আধুনিকীকরণ করতেই হবে, সেটা যুগোপযোগী না হলে তার ছাত্রছাত্রীরা জীবিকাগত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এবার অঙ্ক-শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যাতে সহজে অঙ্ক শেখানো যায় তার জন্য ৫০৬টা মাদ্রাসার জন্য ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে ১০ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৮ লাখ ৫১ হাজার টাকা। আরও দেখছি 'ম্যাথেমেটিকেল কীট্‌স্'-এর জন্য ২০০৯-১০ সালে বেশ কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—মাদ্রাসায় অঙ্ক শেখানোর জন্য এত সাধ্য-সাধনা কেন? আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অঙ্ক তো একটা অত্যাবশ্যক বিষয়। অন্যান্য শিক্ষালয়ে অন্তত একটা স্তর পর্যন্ত অঙ্ক হলো একটা অপরিহার্য বিষয়—পরবর্তী স্তরে সেটা ঐচ্ছিক হতে পারে। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যাল পরীক্ষায় বসতে গেলে পূর্ববর্তী সময়ে অঙ্ক থাকতেই হবে। দার্শনিক প্লেটো তাই অঙ্ককে বিরাট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যারা জীবিকার উচ্চ স্তরগুলোতে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাগত দৈন্য দেখে মায়াকান্নার অশ্রু বিসর্জন করেন, তাঁদের প্রশ্ন করি—মাদ্রাসায় অঙ্ক শেখানোর জন্য এত শ্রম ও অর্থব্যয় কেন? সহজে অঙ্ক শেখানোর কোনও বিশেষ প্রয়াস কি অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেওয়া হয়? তার জন্য বিশেষ বা পৃথক অর্থ-ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে? 'ম্যাথেমেটিকেল কীট্‌স্' এক্ষেত্রে আসবে কেন?

দ্বিতীয়ত, দেখা যাচ্ছে—মাদ্রাসার জন্য সরকারী ব্যয় ক্রমে বেড়ে চলেছে। লক্ষ্য করুন ঃ

বছর	সরকারী ব্যয়
১৯৭৭-৭৮	৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা
২০০৯-১০	৬১০ কোটি টাকা

বৃদ্ধি র হারটা বিস্ময়কর নয় কি?

এটা লক্ষণীয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার ২৮টা রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোর জন্য মোট ব্যয় করে যেক্ষেত্রে ৫০ কোটি টাকা, রাজ্য সরকার সেক্ষেত্রে ব্যয় করছে ৬১০ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, এই খাতে এত বিপুল ব্যয় অন্য কোনও রাজ্যের সরকার করে না।

তাহলে প্রশ্ন উঠবে একটা—এই রাজ্যের সরকার টোলগুলোর জন্য কি করেছে? প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার এই প্রাণকেন্দ্রগুলো উৎসাহের অভাব ও আর্থিক সঙ্কটের ফলে ধুঁকছে। সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখাটাই তো ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের শিকড়কে রক্ষা করা। এই ব্যাপারে রাজ্য-সরকারের ভূমিকা কি, সেটা জানতে চাওয়া কি অন্যায়? এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠবে না তো আমাদের বিরুদ্ধে?

তৃতীয়, এটাও লক্ষণীয় যে, অতি দ্রুত গতিতে এই রাজ্যে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে চলেছে—উৎসাহটা সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে একই ভাবে চোখে পড়ে। নিচের হিসেবটা একটু দেখা যাক—

সাল	জুনিয়ার মাদ্রাসা	হাই-মাদ্রাসা	সিনিয়ার মাদ্রাসা
১৯৭৭-৭৮	৮৬	৭	৫
২৯০৯-১০	৯২	৩৮৭	৪০২

এখন দেখা যাচ্ছে—উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্রাসার সংখ্যা ১৬৭, ফাজিল-৪২, বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ১০৩। অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছে ২৭৯টা।

স্বাভাবিকভাবেই মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিদোয়াই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ৪৩৯৯টা শিক্ষকের পদ বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষাকর্মীর মোট সংখ্যা ওই রিপোর্ট প্রকাশের আগে ছিল ১৯৩৪ জন, নতুন

" মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচীকে বদলে তাদের অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সমজাতীয় করতে হবে, আধুনিক জ্ঞান-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে, যুক্ত করতে হবে বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে। তার বদলে ভোট-ব্যাঙ্কে র দিকে তাকিয়ে সরকার মাদ্রাসার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ালে তার রাজনৈতিক সুবিধে হতে পারে, কিন্তু শিক্ষাগত বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠবে, ক্ষোভ থেকে বাড়বে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে রাজনীতি। "

নিয়োগ করেছে ১৭২৮টা পদের জন্য। নতুন বাড়ি তৈরির জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর পানীয় জল, বাথ্‌রুম ইত্যাদি তৈরি বা সংস্কারের জন্য রাখা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো—এই সব মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা পে কমিশনের নীতি অনুসারেই বেতন, ভাতা, পেনসন ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ মাদ্রাসা-শিক্ষার বিস্তারের জন্য এখন রাজ্য-সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়।

অবশ্যই শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস একটা প্রশংসনীয় ব্যাপার। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটো প্রশ্ন উঠে পড়বেই। প্রথমত, এই পত্রিকায় কয়েকবার পড়েছি—মূলত সীমান্তবর্তী অঞ্চ লেই দ্রুত গতিতে মাদ্রাসা তৈরি হয়ে চলেছে বেশ কয়েক বছর ধরে। এই ব্যাপারে সীমান্তবর্তী ছেলেগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে কেন? শিক্ষাবিস্তার ছাড়াও এক্ষেত্রে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই তো?

পরের প্রশ্নটা হলো, এই বিপুল আয়োজন ও বিরাট অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে কি পাওয়া গেল বা যাবে? স্পষ্ট করে বলা দরকার—বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসায় যা সিলেবাস, সেটা পড়ে ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক যুগের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে বা চাকরির ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হতে পারে? সরকার ভোটের রাজনীতির মাধ্যমে একটা বিশেষ নীতি গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তাতে লাভটা কাদের হবে? জীবিকার দিক থেকে চিন্তা করলে বা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার প্রশ্ন উঠলে উত্তরটা কি হবে?

একটা কথা বহুবার বলেছি। মুসলিম শাসনকে সরিয়েই ইংরেজরা ভারতে প্রভুত্ব করার ফলে ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজ ও ইংরেজী সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষ গড়ে উঠেছিল। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীদের উদ্যোগে হিন্দুরা কিন্তু ইংরেজী ভাষা চর্চা শুরু করায় পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁদের মধ্যে আধুনিকতা এনে দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম সমাজ আরবী ফার্সীকে সম্বল করায় তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন। ডঃ নিমাইসাধন বসুর ভাষায়—'Thus, Muslim failed to fruitfully participate in the general development which owed its origin to western thought and science'—(দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃঃ ৭২)। অনুরূপভাবে অমলেশ চন্দ্র ত্রিপাঠী যে মন্তব্য করেছেন, 'consequently, modern thought with its emphasis on science, democracy and nationalism did not spread among muslim intelectuals...(ফ্রীডম-স্ট্রাগল্, পৃ. ১০৪)। সৈয়দ আমেদ খান প্রমুখের চেষ্টায় অবশ্য অনেক পরে অবস্থাটা সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এর ফলে ক্রমে মুসলিম সমাজে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করেছে। সব দিক থেকেই তখন লক্ষ্য করা গেছে 'মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের দ্রুত উন্নতি'—(বদরুদ্দীন উমর—ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, পৃঃ ৩৫)। এটা এসেছিল স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্যও। সৈয়দ আমেদ ১৮৭৫ সালে আলিগড় আন্দোলন শুরু করেন, হিন্দুরা সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেছেন।

সৈয়দ আমেদ তাঁর সম্প্রদায়কে সরকারের প্রতি আনুগত্য শেখাতে চেয়েছেন (ডঃ পি. এন. চোপরা—ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগ্‌ল ফর ফ্রীডম, পৃঃ ১২)। সেই সময় মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষার দিক থেকে ছিল বেশ অনুন্নত। মাত্র ২৬ জন মুসলমান তখন সারা ভারতে ছিলেন গ্র্যাজুয়েট, অথচ হিন্দু গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ১,৬৩২—(ডঃ শৈলেন্দ্র নাথ সেন—আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃঃ ১৮৩)।

সেই ধারা কিন্তু অব্যাহত আছে একটা স্বাভাবিক কারণে। পিছিয়ে পড়ার পর মুসলিম সমাজ যদি দ্রুত গতিতে আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করত, তাহলে ফারাকটা মনে আসত, কিন্তু এখনও মাদ্রাসা শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তার বদলে দরকার ছিল তাদের অধিকাংশকেই প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা—তাহলেই তারা জীবিকার ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে সমপ্রতিযোগিতায় থাকতে পারত।

একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবার উচ্চ-মাধ্যমিকের খাতা দেখছিলাম—ডিগ্রি পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম থাকে না, কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিকে নামও থাকে। কেন্দ্রটা মুসলিম অধ্যুষিত। দেখা গেল—প্রায় ৮০ শতাংশ ছাত্রীই ফেল করেছে, অধিকাংশের নম্বরই অত্যন্ত শোচনীয়। বোঝা যায়—পড়াশোনার চর্চাই তেমন হয়নি। মনে হয় অনেকেই প্রাইভেটে কোনও রকমে মাধ্যমিকে পাশ করে আন্দাজে পরবর্তী পরীক্ষায় বসে গেছে এবং আবোল-তাবোল লিখেছে।

এই অবস্থায় যাঁরা শিক্ষকতা বা অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত দুর্দশা দেখে রাজনৈতিক বুলি আওড়ান, তাঁরা মূল কারণটা খুঁজে পাননি বা বুঝেও না বোঝার ভান করে আছেন রাজনৈতিক কারণে। আসল কথা—হিন্দু সমাজে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মশাই, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীদের আবির্ভাব ঘটায় সমাজ-সংস্কারের কাজ যেমন হয়েছে, তেমনি হয়েছে সেকুলার বিদ্যাচর্চাও। মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীজন সেই ভারতীয় রেনেসাঁকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। সেই সুযোগে হিন্দুসমাজ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত্ব করে এগিয়ে গেছে। কিন্তু মুসলীম সমাজে তেমনটা হয়নি, আর আরবী, ফার্সী, মাদ্রাসা-মৌলবী শাসকের ফলে তাঁরা অনেকটা পিছিয়ে গেছেন।

এই অবস্থায় মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচীকে বদলে তাদের অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সমজাতীয় করতে হবে, আধুনিক জ্ঞান-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে, যুক্ত করতে হবে বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে। তার বদলে ভোট-ব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে সরকার মাদ্রাসার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ালে তার রাজনৈতিক সুবিধে হতে পারে, কিন্তু শিক্ষাগত বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠবে, ক্ষোভ থেকে বাড়বে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে রাজনীতি।

চ মবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সৃজনশীলতার শত্রু

নবকুমার ভট্টাচার্য

আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হাইস্কুল ও উচ্চশিক্ষার উন্নতিতে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি পুঁজির প্রস্তাব করেছেন। বলা বাহুল্য এদেশে ব্যবসা করার জন্য বিদেশি পুঁজির চাপ শিক্ষাক্ষেত্রেও রয়েছে। উল্লেখ্য ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই হংকং-এর দালাল সংস্থা সি এল এস হিসেব করে দেখে যে, ভারতের বেসরকারি শিক্ষাক্ষেত্রের বাজার মূল্য ৪০০০ হাজার কোটি ডলার। শিশু শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই বাজার মূল্যের অর্ধেক যোগাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পিয়ারসন এডুকম্প ও টিউটর ভিস্ট নামের দুটি শিক্ষাদানকারী কোম্পানী তিন কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে বলে জানিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মুনাফা কামানোর উপর থেকে নিষেধ তুলে নেওয়া হলে ভারতের বিশাল বাজারে দেশি-বিদেশি শিক্ষা কোম্পানি এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিক্রিতে কেনা শিক্ষার মান কেমন হবে? যশপাল কমিটি বলেছিলেন, কিছু মাঝারি মানের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে এখানে দোকান খুলতে ডাকার বদলে তাঁরা চান বিদেশের বরেণ্য বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদেরা আমন্ত্রিত হোন, তাঁদের সান্নিধ্যলাভ করুক আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা। দেখা গেছে আমাদের দেশে বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার দোকান খুললেও বর্তমান শিক্ষা পরিবেশের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কেবল নতুনের আড়ালে সবকিছু চলছে আগের মতোই।

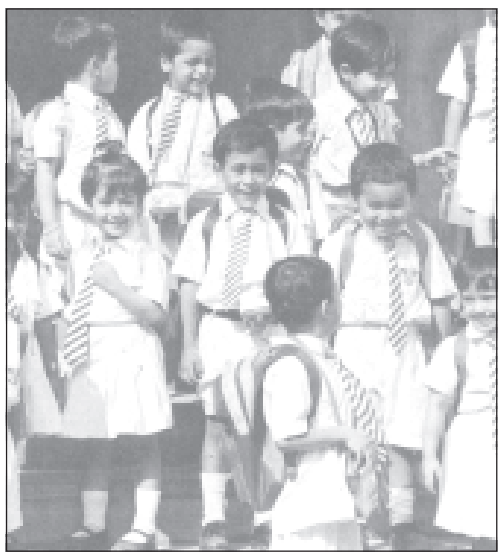

আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষায় বিদেশি ব্যবসায়ীদের প্রবেশ ঘটেছে বেশ কয়েক বছর ধরে। ২০০৪ সালেই ১৪১টি দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশি সহযোগিতায় শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। এখন ৩১টি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে উপস্থিত। তার মধ্যে ১১টি বৃটেনের, ১৩টি মার্কিন। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট (লংবিচ) রাইস, ওরায়ো, কারনেসি, মেলন, কর্নেল, কলম্বিয়া ইউনিভারসিটি, অফ সিঙ্গাপুর, মেরিট সুইস এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। ১১টি বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যমজ প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে কলেজের প্রথম দুবছর বিদেশি প্রতিষ্ঠানটির পাঠ্যক্রম এদেশে বসেই অনুসরণ করা যাবে। পরবর্তী পড়া অবশ্য প্রতিষ্ঠানের দেশের ব্যবস্থাকেই শেষ করতে হবে। শোনা যাচ্ছে স্টানফোর্ড, হার্ভার্ড, হোয়ার্টন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউরোপের আই এন সি ই এ ডি বিজনেস স্কুল এদেশে ক্যাম্পাস খুলতে আগ্রহী। দুবাই-এর জেমস এডুকেশন ভারতে ১০০ নতুন স্কুল খুলবে। দেশি-বিদেশি এই সব প্রতিষ্ঠানকে সমভাবে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী একটা ভালো ব্যবস্থা চালু করার ভাবনাচিন্তা করছেন। এজন্য তিনি মাধ্যমিক ও সমতুল্য পরীক্ষার অবসান ঘটানোর কথা বলছেন। আমাদের দেশে রাজ্যব্যাপী পরীক্ষার ফল দেখে স্কুলের জনপ্রিয়তা অনেকটাই নির্ধারিত হয়ে যায়। এই ফলাফল যদিও পড়ুয়ার মনোযোগ ও একাগ্রতার ফল। এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি স্কুলের জনপ্রিয়তাও নির্ভর করবে ফলাফলের ওপর। কিন্তু বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলের প্রশ্ন না থাকলে ফলাফলের বদলে স্কুলের নামটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমেরিকা, ব্রিটেন, হার্ভার্ড, হোয়ার্টন ইত্যাদি নাম দেখে পকেট বুঝে আমরা ছেলেদের নিয়ে সেখানে অ্যাডমিশন করতে দৌড়াব। নিউ পার্ক আমেরিকান স্কুল অব নিউ জার্সির ছেলে কোনও গোবিন্দপুরের খাঁদুরাণী স্মৃতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়ের চেয়ে অর্থের কৌলিন্যে অনেক সহজে তার পছন্দের স্কুলের এগারো ক্লাসে ভর্তি হতে পারবে, পছন্দের বিষয় নিতে পারবে। সেখানে খাঁদুরাণী বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়ে হয়তো অনেক মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু জনতা তা জানতে পারবে না। কারণ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকলে হয়তো মেয়েটি ছেলেটির চেয়ে অনেক ভালো করে স্কুলের নাম খবরের কাগজে তুলতে পারত। অপর দিকে আমেরিকান স্কুলটির ব্যবসার ক্ষতি হবে, বিদেশিরা আর বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে না—তাই মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব।

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের স্বার্থের চেয়ে নেতাদের রাজনৈতিক স্বার্থের ওপর বেশি প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার এই বাণিজ্যিকীকরণ একটি বৃহত্তর স্বার্থ রাজনৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্গত। যার মাধ্যমে সরকার ক্রমশই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রভাবনা থেকে সরে আসতে চাইছে। শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি থেকে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়ে দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক উদারনীতির সরাসরি ফলাফল হলো সরকারের গণতান্ত্রিক দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার এই প্রচেষ্টা। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিক্ষার এই বেসরকারিকরণ জনগণের স্বার্থে মনে হয় নয়, এর পিছনে রয়েছে এক বিশ্বায়িত শিক্ষাবাজারের গল্প। ইংরেজরা যেমন একদিন কেরানী তৈরি করতে চেয়েছিল নেটিভ ভারতীয়দের, আজও বহুজাতিক সংস্থাগুলিরও সেধরনের ইংরেজি জানা এবং কারিগরি শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও সুলভ শ্রমিক বাহিনী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ তার যোগান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কলাবিদ্যা কোনও স্থান পায়নি। দর্শন বিষয় নিয়ে পড়তে গেলে এখানে ৫০০ গুণ বেশি ফি দিতে হবে।

> আমাদের দেশে রাজ্যব্যাপী পরীক্ষার ফল দেখে স্কুলের জনপ্রিয়তা অনেকটাই নির্ধারিত হয়ে যায়। এই ফলাফল যদিও পড়ুয়ার মনোযোগ ও একাগ্রতার ফল। এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি স্কুলের জনপ্রিয়তাও নির্ভর করবে ফলাফলের ওপর। কিন্তু বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলের প্রশ্ন না থাকলে ফলাফলের বদলে স্কুলের নামটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

> **আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের স্বার্থের চেয়ে নেতাদের রাজনৈতিক স্বার্থের ওপর বেশি প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার এই বাণিজ্যিকীকরণ একটি বৃহত্তর স্বার্থ রাজনৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্গত। যার মাধ্যমে সরকার ক্রমশই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রভাবনা থেকে সরে আসতে চাইছে। শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি থেকে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়ে দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে।**

বেসরকারি স্কুলগুলির জন্য কোনও নির্দিষ্ট সরকারি নীতি নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাড়ার বাংলা স্কুলে রুচি নেই, আমবাঙালি এখন চায় নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাচ্চাকে পড়াতে। চাহিদা আকাশ ছোঁয়া বুঝে বেসরকারি ইংরেজি স্কুলগুলো তুঘলকী নিয়ম লাগু করতে মরিয়া। যথেচ্ছ বেতন তো রয়েইছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নানা আবদার। স্কুলে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বেতন বাড়ানোর কথা, কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে শিক্ষাবর্ষ অর্ধেক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। স্কুলের পোশাক থেকে শুরু করে বই খাতা মলাট জুতো বেল্ট টাই—সমস্ত কিনতে হবে স্কুল থেকে অথবা স্কুলের দেখিয়ে দেওয়া কোনও দোকান থেকে। এই সমস্ত স্কুলের পড়াশুনো সম্পূর্ণ প্রাইভেট টিউশন নির্ভর। স্কুলের শিক্ষকদের কাছেই পড়তে হবে। সেখানেও শান্তি নেই। শিক্ষকদের মধ্যেও রয়েছে লড়াই। যেমন কোনও একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে চার পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন, এদের প্রত্যেকের কাছে কারো পক্ষেই টিউশন দেওয়া সম্ভব নয়। যাঁর কাছে ছাত্র পড়ে না, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি খাতা দেখেন, তাহলে ছাত্রকে জব্দ করতে খাতায় নম্বর কম দেওয়া হয়। ক্লাসে পড়াশোনা হয় না। কারণ রাশি রাশি বেতন নিলেও ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৬০ঃ১। আবার কোথাও ক্লাস চলছে বেসমেন্টে অথচ তার জন্য আলাদা কোনও পরিকাঠামো নেই। এই অবস্থা সারা রাজ্যের।

যে মুহূর্তে সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজির গঠন পাঠন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই মুহূর্ত থেকেই এই সমস্ত অরাজকতার সূত্রপাত। বেসরকারি স্কুল আসলে ব্যবসায়িক সংস্থা। কীভাবে আরও বেশি মুনাফা করা যায় সেদিকে নজর স্কুল কর্তৃপক্ষের। শিক্ষাদান যে অন্যরকম একটা দায়িত্ব সেটা এই সমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ বিস্মৃত হয়েছেন। শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে সাহায্য করে কিন্তু এখানে অনেক সময় মনুষ্যত্বও লঙ্ঘিত হয়। অভিভাবক প্রতিবাদী হলেই তার দায় ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে বহন করতে হয়।

এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কোনও দায় ও দায়িত্ব নিতে রাজি নন। রাজ্য সরকারের মতে—অনুমোদন সরকারের হলেও কিন্তু অর্থ লগ্নি থেকে শুরু করে স্কুল পরিচালনা—সমস্তটাই বেসরকারি হাতে। এমনটাই নাকি প্রচলিত রেওয়াজ বেসরকারি স্কুলের। তাই রাজ্য সরকারের কিছু করণীয় নেই। রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও নির্দিষ্ট নীতি নেই। তাই অনেক উন্নত পরিকাঠামোর প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও চূড়ান্ত অনিয়মের অভিযোগ রাজ্যের বেসরকারি এবং বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির বিরুদ্ধে। বেসরকারি স্কুলগুলোর প্রধান সমস্যা অস্বাভাবিক হারে বেতন বৃদ্ধি। যদিও এ প্রসঙ্গে সরকারি বক্তব্য—তাঁরা এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছেন। স্কুল কর্তৃপক্ষগুলোকে জানানো হয়েছে। বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে তারা যেন অবশ্যই অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আদৌ সেই নির্দেশ কতটা কার্যকরী হচ্ছে এই বিষয়ে কোনও তথ্য নেই।

সোমনাথের শংকরাচার্য শরণ

সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখতে পেলাম প্রাক্তন স্পীকার ও প্রবীণ কমিউনিস্ট (সিপিএম) নেতা (বর্তমানে সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত) সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় কাঞ্চীপীঠের শংকরাচার্যের পদতলে। তিনি শংকরাচার্যকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন। ছবিটি দেখে মোটেই আশ্চর্য হইনি। কারণ নাস্তিক মন্ত্রে দীক্ষিত কমিউনিস্টদের কারো কারো ধর্মে মতিগতি ফিরে আসাটা নতুন কিছু নয়।

সোমনাথবাবুর জন্ম এক ধার্মিক হিন্দু পরিবারে। পিতা ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা, সাংসদ ও বঙ্গীয় সভাপতি। ছাত্রজীবনে সোমনাথবাবু ছিলেন হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবক। এহেন সোমনাথ কেন যে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী কমিউনিস্ট হয়ে উঠলেন সেটাই বড় আশ্চর্য ও রহস্য। তবে শোনা যায়, সোমনাথ যখন বুঝলেন হিন্দু মহাসভার ভবিষ্যৎ নেই, হিন্দুদের কাছেই এই দল প্রত্যাখ্যাত এবং কিছু কমিউনিস্ট নেতার সংসর্গ তাঁকে কমিউনিস্ট হতে বাধ্য করেছে। তাঁর ক্ষমতার প্রতি লোভ ছিল এবং এখনও যে নেই তা নয়। পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর এই কিছুদিন আগেও বলেছিলেন, "আমি কমিউনিস্ট ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।" তবে তিনি মুখে যাই বলুন না কেন, তিনি মনেপ্রাণে কমিউনিস্ট কোনওদিন ছিলেন না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবেন না। তার প্রমাণ, ধর্মের দিকে তাঁর বর্তমান আসক্তি এবং শংকরাচার্যের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা—যা কোনও কমিউনিস্টোচিত আচরণ নয়। তাহলে এটা নিশ্চিত যে তাঁর বয়েসের ভার তাঁকে মানসিকভাবে ধর্মে মতি জুগিয়েছে। এটা তো সত্যি যে জীবন সায়াহ্নে ধর্ম-ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন বহু মানুষ। সোমনাথবাবু হয়তো তাঁদেরই একজন! তাঁর মনের ঘুমন্ত সত্ত্বাটা আজ জেগে উঠেছে!

আমরা জানি, স্বনামধন্য এক কমিউনিস্ট নেতা জীবনসায়াহ্নে এসে ধর্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে। তাঁর এমন মানসিক পরিবর্তনে কিছু কমিউনিস্ট নেতা তখন বলেছিলেন—ডাঙ্গের ভীমরতি হয়েছে। কমিউনিজমে ধর্ম আফিম (লেনিন কথিত)। কিন্তু কোনও কোনও কমিউনিস্টকেও এই আফিম সেবন করতে দেখেছি। প্রয়াত কমিউনিস্ট মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী তাঁদেরই একজন ছিলেন। তিনি তারাপীঠে মা তারার পুজো দিয়েছিলেন। কেরলের কয়েকজন কমিউনিস্ট, কমরেড আবদুল্লা কুট্টি, কমরেড মনোজ প্রমুখ ধর্মাচরণের জন্য (পড়ুন ধর্মের আফিম সেবনের জন্য) পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। সোমনাথবাবুও আজ তাঁদেরই দলে। শংকরাচার্যের স্পর্শ নিশ্চয়ই তাঁর মনে শান্তি জোগাচ্ছে। ব্যতিক্রম ছিলেন সুভাষবাবু। পার্টি থেকে বহিষ্কারের পূর্বে তিনি জীবন থেকেই ছুটি নিয়েছিলেন।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

চিঠিপত্র

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা

সাম্প্রতিক জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা ট্রেন চলাচলের ভয়াবহ চিত্রটি দেশবাসীকে আরেকবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দেশের রেল পরিবহণের ইতিহাসে ঠিক 'এই জাতীয় অঘটন' পূর্বে ঘটেছে বলে মনে হয় না! দুর্ঘটনা কবলিত কোনও কোনও পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আবার কোনও পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সন্তান নিহত হওয়ায় সমগ্র পরিবার আজ রাস্তায় বসেছে। নিহত দেড়শতাধিক মানুষের অনেকের শবদেহ টি.ভি-র দৌলতে যে আকারে বের করে আনার দৃশ্য আমরা দেখেছি তা কল্পনাতীত। সমগ্র ছবিটি মনে করলেই সারা শরীরে শিহরণ বহে যায়। উৎফুল্ল নির্দোষ যাত্রীদের এই মর্মান্তিক পরিণতির কোন্ জবাবে দেবেন রেল কর্তৃপক্ষ? জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের এই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয়া রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব, কর্তব্য, আচার-আচরণ সচেতন দেশবাসীর বড় চোখে পড়ে যায়! এ-কথা ঠিক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র মাননীয়া মন্ত্রী অকুস্থলে গেছেন এবং রেলের এ-ক্ষেত্রে যা করণীয় তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই ভয়ংকর ট্রাজেডির প্রতি যে-গুরুত্ব ও মানবিকতা বোধ দেখানো উচিত ছিল, তার কোনও পরিচয় তাঁর আচার-আচরণে আমরা দেখতে পেলুম না! তার বদলে সমগ্র দুর্ঘটনাটিকে রাজনৈতিক রঙে ভরিয়ে দিলেন! ওনার এই বিসদৃশ আচরণ অত্যন্ত পরিতাপের।

আজ এক মাস হতে চলল তিনি রেলের কেন্দ্রীয় দপ্তর ছেড়ে দলের পৌর নির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। তাই রেলের মতো একটি স্পর্শকাতর দপ্তরের দেখাশোনার সময় কোথায় মাননীয়া মন্ত্রীর? উগ্রপন্থীরা রেলকে টার্গেট করে আগেও কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে। তাই এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তার বিন্দুমাত্র যাত্রীরা দেখতে পেল না! তাই এত বড় হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেল। সাহস করে বলা যায় না আগামী দিনে রেল চলাচলে এই রকম ভয়াবহ বিপর্যয় আর ঘটবে না! দূরপাল্লার ট্রেনের ক্ষেত্রে 'নিরাপত্তা' একটা বড় জিনিষ। কিন্তু এই দুর্ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে আজ ভারতীয় রেলের ক্ষেত্রে সেটা লুপ্ত। ভাগ্যের অবলম্বনই যাত্রীদের একমাত্র ভরসা। 'নিরাপত্তার', সেই সঙ্গে পরিকাঠামোর উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বিস্তৃতি ছাড়াই নিত্য-নতুন দূরগামী ট্রেন চালানো দেখতে আজ আমরা খুবই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মনে পড়ে যায় বহু বছর আগে এই রকম এক দুর্ঘটনার সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে তৎকালীন রেলমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন বিনা দ্বিধায়। এই ধরনের নৈতিক দায়িত্ব পালনের সাহস আজ কোথায়? গভীর বেদনায় বারবার এই কথা মনে হচ্ছে।

—রণজিৎ সিংহ, কলকাতা।

রবীন্দ্র সংখ্যা

আমি আপনাদের স্বস্তিকার একজন উৎসাহী গ্রাহক। দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকা আকারের কপি তো নয়ই, এমনকি বই আকারে মাঝে মাঝে প্রকাশিত কপিও সংরক্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করি না কোনওদিন। কিন্তু এবারের রবীন্দ্রসংখ্যায় (১০।৫) প্রকাশিত প্রত্যেকটি লেখাই আমার এমন অনবদ্য লেগেছে যে এটা কেবল সংরক্ষণ করতেই বাধ্য হলাম না, এর স্থান নির্বাচিত করলাম আমার সংরক্ষিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের বইয়ের পাশে। বাস্তবিকই, অতি উপাদেয়—চমৎকার! আমি মনে করি, সৃষ্টি ও স্রষ্টার আনন্দের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র রসিক পাঠকবুল। তাই মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে এই চিঠি। লেখকদের মধ্যে কাকে ছেড়ে যে কার কথা বলবো বুঝতে পারছি না। —হরিশ গাঙ্গুলী, দমদম, কলকাতা।

চীন রাশিয়ার রপ্তানি বিষবৃক্ষ

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিতের প্রতিবেদনটি পড়লাম। ২৩ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত স্বস্তিকার প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। জঙ্গল মহলের মানুষের উগ্র আন্দোলন থামাতে "অভিযানের জন্য এ পর্যন্ত সরকার যে টাকা খরচ করেছে, সেই টাকা দিয়ে জঙ্গলমহলকে সোনার খনি করে দেওয়া যেত। যে ভাত দিতে পারে না, কিল মারার গোঁসাই হওয়া তার পক্ষে সাজে না।" কিংবা "যৌথ বাহিনী দিয়ে কিছু হবে না। সেবা আর কল্যাণ বোধ নিয়ে সরকার তাঁদের মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ এনে দিক। জাগিয়ে তুলুক অন্তর্নিহিত দেবত্বকে। তখন কর্তাব্যক্তিগণও বুঝবেন, গাঁয়ের মানুষ কত সহজ সরল ও উদার।" নির্মলেন্দু বাবুর এই বক্তব্যগুলো খুবই বাস্তব। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বন্ধুত্বের নামাবলি পরে চীন রাশিয়া ভারতবর্ষে যে বিষফল ছড়িয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে এখন পূর্বভারতে সেই বিষবৃক্ষের জঙ্গলের বিষাক্ত বাতাস জনজীবনকে অস্থির করে তুলেছে। একেই যদি বলা হয় বামপন্থী বিপ্লব, তা হলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন আমাদেরও ওই বিপ্লবের বিষজ্বালা ভোগ করতে হবে। তারপর সাধারণ মানুষের মনে জেগে উঠবে বিষবৃক্ষের জঙ্গল নিশ্চিহ্ন করার প্রেরণা। যে কাজ এখন রাশিয়ার মানুষও করতে ব্যস্ত রয়েছে। বিষবৃক্ষ নির্মূল করে দিয়েছে চিলি ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো। কিন্তু চীনের নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখন সারা পৃথিবীজুড়ে বিষবৃক্ষের আধুনিকীকরণে ব্যস্ত। এরা নানা রকম জনদরদি মুখোশ পরে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা দখলের জন্য অস্থিরতা সৃষ্টি করে চলছে। ভারতে বর্তমান রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মূলেও রয়েছে তাই। এর হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতে হলে জাগিয়ে তুলতেই হবে অন্তর্নিহিত দেবত্বকে। তখন সাধারণ মানুষ আর মুখোশপরা বিদেশী কুচক্রি তল্পিবাহকদের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না। ফিরে আসবে সারাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা।

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

রাজনৈতিক জ্ঞানের সাময়িক অভাব

দেবীপ্রসাদ রায়

পরিপূর্ণভাবে আস্থাজ্ঞাপন না করলেও বৃহদংশ ভারতীয় জনসাধারণ বিজেপি-কে জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং সেই সময় থেকেই বৃহত্তর সংখ্যায় মানুষ মনে আশা পোষণ করেছিল শুধু বিকল্প নয়, এক সার্থক বিকল্পেই উত্তরণ ঘটবে বিজেপি-র। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন সরকার বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলেও যে আদর্শকে সামনে রেখে তার যাত্রা শুরু করেছিল তা থেকে পিছু হটে লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরবর্তী মূল লক্ষ্যাভিমুখী পদক্ষেপগুলি নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমতায় থাকার স্থূল বিজ্ঞাপনসমৃদ্ধ আত্মতৃপ্তির মোহে বন্দী হয়ে গেল। কোথায় গেল রামমন্দির স্থাপনের আন্দোলনের অগ্রগতি? রামমন্দির স্থাপন এন ডি এ সরকারের সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিজেপি তথা আর এস এস পরিবারভুক্ত সংস্থাগুলির আন্দোলন চালু রাখার তো বাধা ছিল না—বাধা থাকলেও তা অনতিক্রম্য বা অসম্ভব ছিল না একটা পরিমিতির কথা মাথায় রেখে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির আন্দোলনই বা থামলো কেন? অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই বা ঠাণ্ডা ঘরে গেল কেন? রামমন্দির প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মুসলিম ধর্মীয়-স্পর্শকাতরতার জন্য সাধারণ মুসলিমদের কাছে ভীতিকর হলেও শিক্ষিত মুসলিম সমাজ-এর যৌক্তিকতাও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিচ্ছিলেন (দেখুন Rediscovery of India–Ansar Hosslan Khan, Oxford Orient Longman) মুসলিম বিল পাশ করিয়ে শাহবানু মামলার ইতি টানলেও মহিলা নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। দীর্ঘস্থায়ী এবং বুদ্ধি দীপ্ত, সুবিবেচিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ ছিল অভিন্ন দেওয়ানী বিধির পক্ষে 'মুসলিম পারসোনাল ল'র বিরুদ্ধে। Slow and steady wins the race—এই আপ্তবাক্য হৃদয়ঙ্গম করার মতো নেতৃত্বের অভাব ছিল বিজেপি-র। ক্ষমতায় আসা এবং থাকার জন্য অধৈর্য্য হয়ে পড়াটাই তার কারণ। ক্ষমতায় আসার পর যে নির্বাচন এল সেই নির্বাচনের প্রচারে অর্জিত প্রাপ্তিগুলিকে যথোচিত গুরুত্ব না দিয়ে স্থূল ব্যয়বহুল চটকদারী বিজ্ঞাপনটির প্রচারে যে দিশাহীনতাকে তুলে ধরেছিল পরাজয় তারই পরিণতি। দিকভ্রান্তি বহুমাত্রিকতার পরবর্তী নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিরও সঠিক বিশ্লেষণ হয়নি, হলে অন্তত নেতৃত্ব বদলের পর বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে পায়ের তলার মাটি শক্ত করার কাজ হোত। তা না করে কখনো সিপিএমের মনোরঞ্জন করে—কখনো শিবু সোরেনের হাত ধরে অক্সিজেন পাওয়ার প্রয়াসগুলি অনৈতিক প্রয়াস বলেই মনে করছে দলের অনেক মানুষ। দেশের অনেক সমর্থক মাটি শক্ত করার কাজে হিন্দুত্বই তার প্রকৃত ব্যাখ্যা সহ আদর্শ হোত, দিশারী হোত। সর্বশিক্ষা

অভিযান, গ্রাম শহর সড়ক যোজনা, বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারের স্ফীতি, পরমাণু নীতি

জনমত

সম্পর্কিত দৃঢ়তা, বিশ্ব-বাজারে বন্ধক রাখা সোনা ফিরিয়ে আনা— অটলবিহারী অর্জিত এই প্রাপ্তিগুলি যথোচিত মূল্যায়নের প্রতি ঔদাসীন্যে হারিয়ে গেল। এমনকী পরমাণু বিস্ফোরণোত্তর আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ভারতীয় অর্থনীতি যে ভাবে নিজেকে রক্ষা করল, যেভাবে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ভারতের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপের জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করলেন তা অভূতপূর্ব এবং তাৎপর্যমণ্ডিত। ২০০৫ সালে পরমাণু চুক্তি সম্পাদনের জন্য আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বুশ দিল্লীতে এসে যে প্রাথমিক চুক্তি করেছিলেন তা বিগত বিজেপি সরকারের সঠিক পদক্ষেপেরই ফল। কিন্তু সে সাফল্যকে ইউপিএ সরকারের ঝুলিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী বিজেপি নেতৃত্ব বিরোধী দলকে অগ্রাহ্য করার বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিবাদ সঠিক ভাবে না জানিয়ে সিপিএম-এর সঙ্গে পরমাণুচুক্তি বিরোধী হয়ে ওঠা এক বিষম ভুল এবং দেশবাসী তা একদমই মেনে নেয়নি, কিন্তু তবুও আশ্চর্য এই যে পরবর্তীকালেও সিপিএম-এর অধোগতির সঙ্গে অনেকে যুক্ত করে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সিপিএম সরকারের দানবিক ভূমিকার কথা ভুলে গিয়ে মমতা-বিদ্বেষ প্রকাশে বিজেপির উৎসাহ প্রদর্শন করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ঘৃণা অর্জন করছে বিজেপি।

সাধারণ মানুষের মনে মমতার স্থান কোথায় এবং কেন— সে বিশ্লেষণেও বিজেপি নেতৃত্ব অক্ষম, সিপিএমকে হটানোর যে একেবারে অসম্ভব ব'লে 'মিথ' সৃষ্টি হয়েছিল এবং যাকে সবাই প্রায় অসহায়ভাবে মেনে নিয়েছিল। উদয়ন নাম্বুদ্রিপাদের 'Bengal Nights Without End' বইতে যা প্রকাশিত হয়েছে, সেই অবস্থাকে পরিবর্তন করেছে অবিশ্বাস্য ভাবে একজনই—সে মমতা ব্যানার্জি। অত্যাচারিত, রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গ তাকে ধরেই যে স্বপ্ন দেখছে তার বিরুদ্ধে কুৎসায় মেতে ওঠা বিজেপি-কে সাধারণ মানুষ ক্ষমা করবে? নিজের জোরে পশ্চিমবঙ্গে হরিপদ ভারতীই জনসঙ্ঘের (বিজেপি-পূর্ব সংগঠন) শেষ প্রতিনিধি। দোষ ত্রুটি মানুষের থাকে, রাজনৈতিক জ্ঞানেরও সাময়িক অভাব থাকতে পারে—কিন্তু সেইসব অতিক্রম করে মমতা যে 'মমতা'— এটা বুঝতে হবে। সাধারণ মানুষের মনের গভীরে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল বিজেপি-র প্রতি আস্থা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাভারকর-হেডগেওয়ার-শ্যামাপ্রসাদের বৃহত্তর ব্যঞ্জনাময় 'হিন্দুত্ব'ই যে একমাত্র ভরসাস্থল, তা যেন মনে রাখে বিজেপি। সুবিধাবাদী মনোভাবে একে কখনো মুখ কখনো মুখোস করা চলবে না। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, সেটাই হচ্ছে বাস্তবে। পশ্চিমবঙ্গে 'অমারাত্রির অবসান' সম্ভাবনা যার নেতৃত্বে হতে যাচ্ছে—তার কুৎসা রটনা, তার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা—বিজেপি তা মনে রাখবে? একবার কি ভাববে?

ঠাকুরের পদচিহ্ন

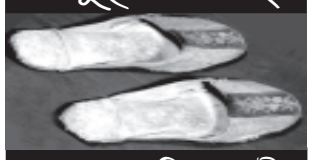

মনোমোহন মিত্রের বাটী

চরণে ধরিয়া তব, কহিব প্রকাশি

অর্ণব নাগ

বিশ্বেশ্বরীর বিবাহ। পিতৃহারা কন্যা। তবে বিবাহের আয়োজনে কোনও খামতি নেই। বাবার ঘাটতিটা পুষিয়ে দিচ্ছে অগ্রজ মনোমোহন। মনোমোহন আর তার মাসতুতো ভাই কাম বন্ধুপ্রবর রামচন্দ্রের যৌথ তৎপরতায় ঢেকে যাচ্ছে বহু কিছুর অভাব। রাম পেশায় ডাক্তার। নিশ্চিন্ত মনোমোহন জননী শ্যামাসুন্দরী। কারণ পাত্রটি মন্দ নয়। নাম রাখাল। লেখাপড়ায় ততটা ভালো নয়, তবে ছেলেটি সৎ-ভদ্র-একটু লাজুক প্রকৃতির, উপরন্তু কোনও বদ নেশাও নেই। তার ওপর বাবা হারাণচন্দ্রের বিশাল জমিদারি রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণার আড়বেলিয়া গ্রামের কাছে সিক্‌রা-কুলীন গ্রামে। এদের পদবী ঘোষ। অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের তালিকাটা রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে বসে তৈরি করেছেন মনোমোহন মিত্র। হাজার হোক, বাবা ভুবনমোহনের অভাবটা একটু অনুভূত তো হবেই। আদতে এঁরা কোন্নগরের লোক। সেখানকার নাম করা ডাক্তার ছিলেন ভুবনমোহন। বিবাহ-বাসর বসেছে ২৩ নম্বর সিমুলিয়া স্ট্রীটে। কাছেই গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের ৩ নম্বর বাড়ি। সেই বাড়ির 'নরেনদাদা', 'দিদি' মানে স্বর্ণময়ী আর মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাত্রী বিশ্বেশ্বরী ওরফে 'বি'-র বহুদিনের খাতির। কারণটা সুস্পষ্ট। নরেন্দ্রজননী ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে ভাগ্নী হলেও তাঁর কাছেই মানুষ রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের মাতৃদেবী তুলসীমণি আর শ্যামাসুন্দরী হলেন দুই বোন। শ্যামাসুন্দরীর পুত্র মনোমোহন তাই রামের মাসতুতো ভাই। রামচন্দ্রের সূত্রেই সেই কারণে মনোমোহন মিত্তিরের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম রয়েছে সিমলের দত্তবাড়ির। অবশ্য কন্যার চাইতে পাত্রটির সঙ্গেও কম কিছু হৃদ্যতা হবে না নরেন কিংবা মহেন্দ্রর। কারণ রাখালের বিবাহত্তোর কয়েকটা বছর কাটবে সেই ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের দত্তবাড়িটাতেই। অভ্যাগতদের তালিকায় রয়েছেন আরেক মিত্তির, ইনি আবার রায়বাহাদুর। নিবাস উত্তর কলকাতার বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট। মস্ত বড় অফিসার। ওনার স্ত্রী তারাসুন্দরী— শ্যামাসুন্দরী আর তুলসীমণির আরেক বোন। সুতরাং ইনি সম্পর্কে রাম আর মনোমোহনের মেসোমশাই। অভ্যাগতদের

পরম্পরা

তালিকা সুদীর্ঘ। তাতে রয়েছে আত্মীয়রও বাড়া বিশ্বেশ্বরীর দিদি সিদ্ধেশ্বরী ও জামাইবাবু শশীভূষণের নাম। দিদির বিয়ে বলে কথা। তাই আনন্দে উচ্ছল বোন সুরেশ্বরী। অভ্যাগতদের তালিকায় সংযোজিত আরও এক মিত্তির। ইনি প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ।

কোলকাত্তাইয়া বিয়ে। তায় রাখালচন্দ্রের শ্বশুরবাড়ি কোলকেতায়। হারাণচন্দ্রের তাই শখ জেগেছে তার জমিদারির প্রজাদেরও কোলকেতাওয়ালা বিয়ের ভোজ খাওয়াবেন। আর এতেই ঘটল বিপত্তি। মাছের পোলাও মুখে দিয়েই সেই গ্রাম্য প্রজারা আর্তনাদ করল—"মা গো! কি গন্দি ভাত, পচা হলুদ দিয়ে ভাত রেঁধেছে। তাতে আবার মাছ দিয়েছে! ভাতেতে কখনও কি তেল দেয়।" পোলাওয়ের জাফরানের গন্ধে তাদের বমি হতে লাগল। সেই বমি আটকাতে দু'চার টুকরো পেঁয়াজ দেওয়া হলো। বাধ্য হয়ে সাদা ভাত আর কলাইয়ের ডালেই হারাণবাবুকে সমাপ্ত করতে হলো বৌভাতের ভোজ!

ফেরা যাক সেই বিবাহ-বাসরে। নিতান্ত হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-উল্লাসের বিবাহ-বাসর নয় এটা। আসলে বিরাট মজলিস বসেছে, রামকৃষ্ণ ভাবানুরাগীদের মজলিস। আধ্যাত্মিক রস সেখান থেকে নিংড়ে নিংড়ে বেরোচ্ছে। নিংড়োনোর কাজটা অনেকে মিলে করছেন। যেমন—রামচন্দ্র, মনোমোহন, সুরেন্দ্র। গামছা মেলা রয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। মেলে দিয়েছেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুর। টুপ টুপ শব্দ হচ্ছে। বোধহয় জল ঝরছে। আসলে আধ্যাত্ম রস। সেই রসে সিঞ্চি ত হচ্ছেন শ্যামাসুন্দরী দেবী। সদ্য স্বামীহারা হয়েছেন। সান্ত্বনা খুঁজতে ঠাকুরের আহ্বানে গেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর খাচ্ছেন। পাতে রয়েছে আস্ত একটা মাছের মুড়ো। একি! একি করছেন ঠাকুর? সদ্য বিধবার পাতে কিনা তুলে দিচ্ছেন সেই মুড়ো! এ কি লীলা ঠাকুরের? তিনি কি বিধবাকে পরীক্ষা করছেন? শ্যামা বিনা-দ্বিধায় গ্রহণ করছেন সেই মুড়ো। প্রসাদ জ্ঞানে। হিন্দুর ধর্মজীবনে নিঃশব্দ বিপ্লব। শ্যামাসুন্দরীর জামাই রাখালচন্দ্র সদ্য একটি পুত্রসন্তানের জনক। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনোয় একেবারে মন নেই। খালি কুস্তি শেখার শখ। লাজুক রাখাল ঠাকুরের স্পর্শে বদলে যাচ্ছে। হয়ে উঠছে তাঁর মানসপুত্র। এই পুত্রের জন্য ঠাকুরের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এক্ষেত্রে ভরসা রাখাল-জায়া বিশ্বেশ্বরীর সেই 'নরেনদাদা'। তাঁকে ঠাকুর বলছেন, "রাখাল হলো আমার অতি দুর্বল ছেলে। একে বিশেষ করে দেখাশোনা করো।" ভবিষ্যত হাতছানি দিচ্ছে। নরেনদাদা মানে ভুবনবিদিত স্বামী বিবেকানন্দ

ঠাকুরের 'রেস্ট হাউস' হল মনোমোহন মিত্রের বাড়ি। পূর্বতন ঠিকানা ২৩ নং সিমুলিয়া স্ট্রীট, বর্তমান ঠিকানা ৬৪, ডাঃ নারায়ণ রায় সরণী, কলকাতা-৬। ঠাকুরের আগমনের সময় বাড়িটি দোতলা ছিল, বর্তমানে তিনতলা। কথামৃত পড়ে মনে হয় একতলার এই বৈঠকখানার ঘরেই প্রথমে বসেছিলেন ঠাকুর। এরপর দোতলার অন্দমহলে যান। যদিও কবিরাজ ভুবনেশ্বর গুপ্ত শর্মার কাছে বাড়িটি ১৯০৯ সালে হস্তান্তর হবার পর পুরোনো বাড়িটির কোনও বৈশিষ্ট্যই আর অবশিষ্ট নেই। তবে স্থানীয় মানুষজনের বাপ-দাদার স্মৃতি আর কথামৃত পড়ে মনে হয় দোতলার বন্ধ জানালার ঘরে বসেই 'সেবা করেছিলেন' ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।— ছবি ঃ শিবু ঘোষ।

আগামীদিনে স্থাপন করবেন 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন'। তাঁর দেহান্তের পর চারাগাছটিকে জল দেবার দায়িত্ব বর্তাবে রাখালের ওপর। তখন অবশ্য তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ। ত্যাগ ও তিতিক্ষার অপরূপ প্রতিমূর্তি। পৃথিবী দেখবে সেই চারাগাছ একদিন বিশাল মহীরুহে রূপান্তরিত হবে। অনেকগুলো ঝুরি নামবে। গুরুপ্রাণ রামচন্দ্র। কন্যার অকালমৃত্যু তাঁকে নড়িয়ে দিয়েছে। সেই তপ্ত হৃদয়ের জ্বালা জুড়োচ্ছেন ঠাকুর। আর চিন্তা কি? ঠাকুর কৃপা করছেন রাখালের সম্বন্ধী মনোমোহনকে। সূচনা হচ্ছে তার জীবনের নব-অধ্যায়ের। বদলে যাচ্ছে সবকিছু। 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় তিনি লিখছেন। প্রচারিত হচ্ছে—তাঁর আরাধ্য দেবতা হলেন অবতার। মনোমোহনের সবেধন নীলমণি সন্তানের নাম গৌরীমোহন। এক্কেবারে বাবার স্বভাব পেয়েছে। ইনিই পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবেন। নাম হবে ব্রহ্মচারী মাতৃকাচৈতন্য। রাখালচন্দ্রের দুই ভায়রাভাই শশীভূষণ দে আর বলরাম সিংহ ঠাকুরের মাঝেই আধ্যাত্মিক শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। অকস্মাৎ পত্নী সুরেশ্বরীর অকাল প্রয়াণে বলরাম শ্রীশ্রী ঠাকুরের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানেই খুঁজে নিলেন জীবনের সাশ্রয় করা আশ্রয়টুকু। নাম হলো স্বামী কাশিকানন্দ। ভক্তি রসের স্রোতে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন ঠাকুরের রসদদার সুরেন্দ্রনাথ মিত্তির। তাঁর বাড়িতে অন্নপূর্ণা আর জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। ঠাকুর আসছেন মাতৃ-সন্ধানে।

ঠাকুর থাকেন দক্ষিণেশ্বরে। আসছেন কলকাতার ভক্ত-বাড়িতে। যাচ্ছেন শ্যামপুকুরে, যাচ্ছেন কৈশোরের লীলাভূমি ঝামাপুকুরে। দুই পুকুরে ডুব দিয়ে নররূপী নারায়ণের খোঁজে তল্লাশী চলে অনবরত। এই

(এরপর ১২ পাতায়)

হেরিটেজের অপেক্ষায় তাজপুরের ফুলেশ্বর মন্দির

প্রিয়ব্রত সরকার॥ হাওড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অনেক প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরগুলি প্রাচীনত্বে, গঠনশৈলীতে, বিগ্রহ, কারুকার্য, লোককথা বিভিন্ন দিক দিয়ে অন্যান্য মন্দির বা সৌধ থেকে কোনও অংশে কম নয়। হাওড়া জেলার গ্রামীণ অংশে যে সব মন্দিরগুলি রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাকড়দহের মাকড়চণ্ডী মন্দির, আমতার মেলাইচণ্ডী, আমতার কাছে তাজপুর ফুলেশ্বর শিবমন্দির, পেঁড়োর দুর্গা মন্দির, মেল্লকের গোপালের মন্দির, খালোড় আর উলুবেড়িয়ার কালীমন্দির। এই সমস্ত মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থের অভাবে জীর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে বসেছে। মন্দির সংস্কার করলে বিশেষ এক গোষ্ঠীর আপত্তি, ভোট সর্বস্ব রাজনীতি এবং সর্বোপরি তথাকথিত সাম্প্রদায়িক হওয়ার ভয়ে সরকার ফিরে চেয়েও দেখে না।

তাজপুরের ফুলেশ্বর মন্দির

এখন যে মন্দিরটির কথা বলবো তা হলো শ্রীশ্রী ফুলেশ্বর স্বয়ম্ভু শিবমন্দির। এটি আমতা থানার তাজপুর গ্রামে দামোদরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। হাওড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই মন্দিরে হুগলী, কলকাতা, দুই ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমানসহ বিভিন্ন জেলা থেকে পুণ্যার্থী এসে থাকেন। মন্দিরটির গঠনশৈলীও বিস্ময়কর। সমতল থেকে মন্দিরের গর্ভগৃহ প্রায় কুড়ি ফুট নীচে এবং সেখানে রয়েছে স্বয়ম্ভু শিব-লিঙ্গ। নীচে অপরিসর সিঁড়ি দিয়ে নেমে দর্শন করতে হয়। এই মন্দিরের আরও বৈশিষ্ট্য হলো—শ্রাবণ থেকে পৌষ এই ছয় মাস মন্দিরের গর্ভগৃহ সম্পূর্ণ জলমগ্ন থাকে। বিগ্রহ জলে ডুবে থাকায় ওইসময় নিত্য পূজারতি উপর থেকেই হয়। পরে এই জল ধীরে ধীরে কোনও অজানা পথে আপনা হতেই বেরিয়ে যায়। স্থানীয় লোকেদের কথায় বাবা ফুলেশ্বর ছয়মাস জলের মধ্যে থেকে শরীর শীতল করেন। যখন মন্দিরের গর্ভগৃহে জল থাকে না তখন শিবের মাথায় যতই জল ঢালা হোক না কেন একটি নির্দিষ্ট স্থানে চলে আসে যা মনুষ্য সৃষ্ট নয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে যেটি শিবলিঙ্গ হিসাবে পূজিত তা প্রাকৃতিক পাথর এবং পঞ্চ মুন্ড বিশিষ্ট, ইহাই স্বয়ম্ভু।

মূল মন্দির ছাড়াও, মন্দিরের সামনে একটি ৪০৪০ (চল্লিশ) ফুট নাটমন্দির রয়েছে যার চর্তুদিকেই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। মন্দিরের বিভিন্ন জিনিষপত্র রাখার জন্য রয়েছে ৫টি ঘর, যাকে তোষাখানা বলে। আর রয়েছে মন্দিরের উত্তরদিকে ৯৯ শতক পরিমাপের "গৌরীশঙ্কর" নামে একটি পুষ্করিণী। মন্দিরের নামে রয়েছে প্রায় চুয়াল্লিশ বিঘা

(এরপর ১২ পাতায়)

কৃষি ও গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

রুমা সাহা।। গ্রামীণ ভারতে অধিকাংশ পরিবারে প্রধান জীবিকা হল কৃষি। বিগত দুটি দশকে যে নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে, তার সুফলের দিকটি যদি দেখা যায়, তাহলে বলতেই হয় মোট জাতীয় উৎপাদনে বৃদ্ধি র হার বার্ষিক ৮-৯ শতাংশে পৌঁছানো এই সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই সময়ে নানা ধরনের বৈষম্য বেড়ে গেছে। এই বৈষম্যের চারটি দিক উল্লেখ করা যেতে পারে— অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগত বৈষম্য, আঞ্চ লিক বৈষম্য, জাতি ও ধর্মগত বৈষম্য, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য। এই

চাষের কাজে মহিলারা

বৈষম্য দূর করার জন্য গ্রামীণ উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে। গ্রামীণ উন্নয়নের মধ্যে কৃষির উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষির উন্নয়নে উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ ভারতে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, আঞ্চ লিক বৈষম্য ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে উন্নততর কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ কিভাবে প্রভাবিত করে তার একটি মূল্যায়ন করা। কৃষি উন্নয়নের মাপকাঠিতে যেমন, ত্রিপুরা এখনও একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য। আবার ত্রিপুরার অভ্যন্তরে গ্রামীণ এলাকায় যে চল্লিশটি ব্লক রয়েছে তাদের কৃষি পদ্ধ তির উন্নয়নের মাপকাঠিতে সাজালে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। তাই কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা নির্ধারণ করার জন্য একটি সুস্পষ্ট প্রশ্ন করা যেতে পারে। প্রশ্নটি হল— কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া এবং এগিয়ে থাকা ব্লকগুলির মধ্যে মহিলাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অবস্থানে কোনও পার্থক্য কি আমরা দেখতে পাই? এই প্রশ্নটি ছিল এই গবেষণাপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর কি উত্তর পাওয়া গেছে সেটা পরে আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু এর আগে আরও দুটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ করতে হয়, যে প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক এবং মৌলক প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল এই যে, একটি উন্নততর অঞ্চ লের বা ব্লকের যারা কিছুটা হলেও জমির মালিক এবং যারা দিনমজুর বা ক্ষেতমজুর সেই পরিবারের মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য কি আমরা দেখতে পাই? অর্থাৎ উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ ভূমিহীন এবং জমির মালিক পরিবারগুলির মধ্যে বন্টন বৈষম্য ঘটাচ্ছে কিনা তার একটি উত্তর এই প্রশ্নটিতে পাওয়া যেতে পারে। তৃতীয় প্রশ্নটি কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জুম চাষ ও স্থায়ী চাষ সহাবস্থানের ফলে যে কৃৎকৌশলগত দ্বৈতাবস্থা ত্রিপুরায় রয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এখানে যে প্রশ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল, স্থায়ী চাষের যে ক্ষেতমজুর পরিবার এবং জুমিয়া পরিবার সেই পরিবারগুলির মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে কোনও পার্থক্য দেখা যায় কিনা? একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এই তিনটি প্রশ্ন যতই সুস্পষ্ট হোক না কেন, এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর পাওয়া ততটা সহজ নয়। সঠিক উত্তর পেতে গেলে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধ তি যেমন নির্ভরযোগ্য হতে হবে, তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধ তিও তেমনি যুক্তিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। এগুলি যে কোনও গবেষণাধর্মী কাজের পদ্ধ তির সমস্যা বা মেথোডোলজিক্যাল প্রশ্ন। বিষয়টিকে সহজ করে ব্যাখ্যা করার জন্য তর্কের খাতিরে ধরা যাক যে, তথ্য সংগ্রহে কোনও ত্রুটি ছিল না। অবশ্য সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন তথ্য সংগ্রহ কতটুকু সম্ভব সেটাও বিচার্য। এই ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের সমস্যাটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ধরা যাক, দুটি ব্লক রয়েছে, যার একটি কৃষি প্রযুক্তির উন্নত এবং অপরটি অনুন্নত। ধরা যাক, এটাও পাওয়া গেল যে, উন্নত ব্লকে মহিলাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান অনুন্নত ব্লক থেকে অনেক উপরে। কিন্তু তাতে কি প্রমাণিত হয় যে, উন্নত প্রযুক্তির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে? মোটেই সেটা প্রমাণিত হয় না। এই জায়গাটা থেকেই গবেষকদের মাথা ব্যথা শুরু হয়। নানাভাবে অদৃশ্য উপাদানগুলি যাদের কনফাউণ্ডিং ভেরিয়েবল্ বলা হয় কিভাবে প্রভাব সৃষ্টি করছে সেটা মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইকনোমেট্রিক্সের প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এই পদ্ধ তিতে প্রথমে যত ধরনের বিষয় মহিলাদের শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়, যার মধ্যে একটি হল কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়নের মান। যদি দেখা যায় যে, কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়নের মান ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলি পরিসংখ্যানগতভাবে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাহলেই একমাত্র কৃৎকৌশলের পার্থক্যের জন্য মহিলাদের অবস্থানের পার্থক্য হচ্ছে এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে। কিন্তু এই ধরনের যুক্তির মধ্যে সকল ধরনের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায় না। তাই এই গবেষণা আরও একটি উন্নতমানের বিশ্লেষণ পদ্ধ তি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে, যাকে স্টকাস্টিক ফ্রন্টিয়ার পদ্ধ তি বলা হয়। এখানে আলোচ্য ব্লকগুলির পরিবারগুলি সরকার যে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, যেমন স্কুল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেগুলি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে কিনা সেটাই বিচার করা হয়েছে এবং এখানে প্রযুক্তি ও অন্যান্য বিষয়গুলির প্রভাব কতটুকু সেটা দেখা হয়েছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি প্রশ্ন এই গবেষণাপত্রে বিচার করা হয়েছে, সেটা বুঝতে গেলে সম্পূর্ণ গবেষণাপত্রটি পড়তে হবে। এবার এই গবেষণা থেকে যে মৌলিক সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছানো গেছে সেগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়। আমরা জানি যে, বর্তমানে ত্রিপুরায় চল্লিশটি ব্লক রয়েছে। তবে এই গবেষণা ২০০১ সালের সেন্সাসের আটত্রিশটি ব্লক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এই ব্লকগুলির কৃষির উন্নতি থেমে রয়েছে কিনা সেটা বিচার করার জন্য সপ্তম পরিকল্পনা থেকে দশম পরিকল্পনা পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে এই ব্লকগুলির কৃষি সংক্রান্ত দুটি সূচক নির্মাণ করা হয়েছে। এর একটি হলো ধানের গড় উৎপাদন এবং দ্বিতীয়টি হলো উচ্চ ফলনশীলের বীজের আওতায় কৃষি জমির পরিমাণের শতাংশ। যে ব্লকগুলির ক্ষেত্রে এই দুটি সূচকের মান সপ্তম পরিকল্পনা থেকে দশম পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই ব্লকগুলিকে কৃষি প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়া ব্লক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দেখা গেছে, এই ব্লকগুলিতে জুম চাষের পরিমাণ বেশি। এই ভাবে ব্লকগুলিকে সাজানোর পর তিনটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে—উচ্চ প্রযুক্তির ব্লক এবং পিছিয়ে পড়া ব্লক। এবার মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে দুই ধরনের সূচক বিচার করা হয়েছে—একটি হলো আমাদের চির পরিচিত সাক্ষরতার হার এবং অপরটি হলো পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার ব্যবধান। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতটি না নিয়ে পরিবারের গড় আয়তনকে বিচার করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে এই কথাটি বলা যায় যে, পরিবারের গড় আয়তন বড় থাকার মানে হলো মহিলাদের প্রজনন সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর একটি নেতিবাচক চাপ রয়েছে। উপরে যে পদ্ধ তিগত ব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটা প্রয়োগ করলে যে মূল সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছানো গেছে সেটা হলো এই যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ব্লকগুলিতে মহিলাদের শিক্ষাও পিছিয়ে রয়েছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কথাটি মিলে যায় ৬২ শতাংশ। অতএব কৃষির উন্নয়ন মহিলাদের উন্নয়নে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর কারণ হলো সরকার স্কুল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যে সুযোগগুলি সৃষ্টি করছে সেগুলি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সেই ব্লকগুলি বেশি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারছে যারা প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত। সরকারের নীতি নির্ধারণের জন্য এই সিদ্ধান্তটি তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলেই মনে হয়।

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ)

চরণে ধরিয়া তব, কহিব প্রকাশি

(১১ পাতার পর)

দুই পুকুরের মাঝামাঝি সিমলেতে তাই আগমন হচ্ছে তাঁর।

ভক্ত সুরেন্দ্রর বাড়িতে ধরা দিচ্ছেন নরেন্দ্র (নরের ইন্দ্র)। ঠাকুর একটু জিরোতে চাইছেন। ভক্তসখা ভক্ত ছাড়া থাকেন কি করে? সেই যে বিবাহ-বাসরের কথা বলছিলাম, সেখানে এত ভক্ত, ঠাকুর যাবেন না তাই কখনও হয়!'

ঠাকুর তাই আসছেন ২৩ নম্বর সিমুলিয়া স্ট্রীটের সেই মনোমোহন মিত্তিরের বাটীতে। সন—১৮৮১ খৃস্টাব্দ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ), দিবস—৩ ডিসেম্বর (১৯ অগ্রহায়ণ), শনিবার। দিনাঙ্ক—বিকেল ৪টে।

বাড়ির বিবরণ—ছোট-দ্বিতল-ছোট উঠোন। ঠাকুর বসেছেন বৈঠকখানায়। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর লীলা-পার্ষদসহ ভক্তবৃন্দ। রয়েছেন কেশব সেন, রাম, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, ত্রৈলোক্য, ঈশান মুখুয্যে। মনোমোহন ব্যস্ত আতিথেয়তায়। দোতলার অন্দরমহলে শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত ঠাকুরের সেবার আয়োজন করতে। বোধকরি মনোমোহন ভগ্নী সুরেশ্বরীর তখনও বিবাহ হয়নি।

তাই আয়োজনে মাতাঠাকুরাণী শ্যামাসুন্দরীকে তার পক্ষে সহায়তা করা বিচিত্র নয়।

ঈশান মুখুয্যের সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর, সংসার নিয়ে। ঠাকুর বসলেন বাড়ির প্রাঙ্গণে। তাঁর বামদিকে বসেছেন কেশব সেন, ডানদিকে রামচন্দ্র দত্ত। ভাগবত পাঠ হচ্ছে। গান জুড়েছেন ত্রৈলোক্য—'জয় জয় আনন্দময়ী ব্রহ্মরূপিণী'। কীর্তনানন্দে উল্লসিত ঠাকুর। স্বর্ণবিন্দুর মতো ঘাম ঝরে পড়ছে গা বেয়ে। তাঁর খিদে পেয়েছে। অন্দরমহল থেকে এল একথালা মিষ্টি। কেশব থালা ধরে আছেন, ঠাকুর খাচ্ছেন। কেশব জলপাত্র ধরে আছেন, ঠাকুর পান করছেন। ঠাকুরকে পান করিয়ে এবার ঠাকুরের উপদেশামৃত পান করবেন ব্রহ্মানন্দ। আজকের সাবজেক্ট—সংসার।

অন্তঃপুরে ঠাকুর খেতে বসেছেন। পরিবেশন করছেন শ্যামাসুন্দরী। এগিয়ে দিচ্ছেন একগ্লাস বরফ জল। প্লেটে সাজানো 'মিষ্টান্নাদি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য'। ঠাকুর হাসছেন—'আমার জন্য এত করেছো!'

কলকাতায় এলে বিশ্রাম নেবার জন্য তাঁর এই 'রেস্ট হাউস' (২৩নং সিমুলিয়া স্ট্রীট, পরিবর্তিত ঠিকানা-৬৪, নারায়ণ দত্ত সরণী)-এ কিছুক্ষণ কাটিয়ে অন্যত্র যেতেন ঠাকুর। এমন দু'টো দিন আমাদের জানা— ১০ ডিসেম্বর, ১৮৮১ খৃস্টাব্দ এবং ১৯ নভেম্বর, ১৮৮২ খৃস্টাব্দ।

তথ্যসূত্র ঃ অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম

চরণ চিহ্ন ধরে—নির্মল কুমার রায়

তাজপুরের ফুলেশ্বর মন্দির

(১১ পাতার পর)

জমি। এই জমির বেশিরভাগই বর্তমানে দখল হয়ে গিয়েছে। বর্তমান মন্দির কমিটির সম্পাদক মানস রায় কথাপ্রসঙ্গে জানান যে ১২ একর ৪৯ শতক জমির খাজনা মন্দির কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সরকারকে মিটিয়ে দিয়েছে। তবুও মন্দির সংস্কারের জন্য কোনওরকম সাহায্য সরকার থেকে এখনও পর্যন্ত পায়নি।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রামাণ্য নথিপত্র থেকে জানা যায়, বর্তমান মন্দিরটি আনুমানিক ১০৫০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত। তাজপুরের তৎকালীন জমিদার রামদেব রায়ের পত্নী শ্রীমতি পদ্মাবতী দেবী স্বপ্নাদেশ পান এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে জঙ্গালাকীর্ণ ওই স্থান এবং স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ খুঁজে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রধান সেবাইত নিযুক্ত হন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়। এই মন্দির থেকে সর্দি, কাশি, হাঁপানী ও যক্ষ্মার ঔষধ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজও দেওয়া হয় যা নাকি দৈবাদেশে প্রাপ্ত। অনেক মানুষ এই ঔষধে সেরেছে।

নিত্য প্রতিদিন দুইবার পূজারতি হয়। তবে বৎসরে দুইবার বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসের গাজন উৎসব। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ করে গাজনে এই মন্দিরে বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার পূণ্যার্থী আসে। সাতদিন ধরে চলে মেলা।

সম্পাদক মানস রায় এবং সদস্য নন্দলাল মন্ডল জানালেন—এই মন্দিরটি সরকার কর্তৃক জাতির উত্তরাধিকার (হেরিটেজ) ঘোষণা করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আমতা বি ডি ও, উলুবেড়িয়া এস ডি ও এবং জেলা পরিষদকে সবিস্তারে জানিয়েছেন হেরিটেজ ঘোষণা করার জন্য। বি ডি ও থেকে খোঁজ খবর নিয়েছেন এই বিষয়ে। ভয়ের কথাও জানালেন, কিছু সমাজবিরোধী ও রাজনৈতিক দলের নেতারা এই ধর্মস্থানটিকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে। বিশেষ এক সম্প্রদায়ের গুন্ডাদের লেলিয়ে দিয়ে হুমকি দেওয়াচ্ছে। জমির দখল ছাড়ছে না, বিভিন্ন উপায়ে গন্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তবে এ ও জানালেন, বাবা ফুলেশ্বরের কৃপাতে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমরা আশাবাদী, সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রয়েছি আমাদের এলাকার সাংসদ কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রীর দিকে আর রেলমন্ত্রীর দিকে—যদি ফুরফুরা শরীফ থেকে ট্রেনের 'ফু'—বাবা ফুলেশ্বরের কানে আসে।

আল-কায়দার নেতা আওলাকি-কে নিয়ে সতর্কবার্তা বৃটেন পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইংল্যান্ডের গোয়েন্দা সংস্থা ও এম-১৫ সতর্কবার্তা দিয়েছে যে, আল কায়দার এক ধর্মপ্রচারক বৃটিশ মুসলিম যুবকদের সে দেশে সন্ত্রাসবাদী হানার কাজে সংগ্রহ করছে। ধর্মপ্রচারকটির নাম আনোয়ার-আল-আওলাকি। মধ্য-প্রাচ্যের ওপর ভিত্তি করে সে তার জাল ছড়াচ্ছে বলে এ-১৫ সূত্রে খবর। নিরাপত্তা-সংস্থাটির আশঙ্কা, গেরিলা কায়দায় বৃটেনে

আওলাকি

আগামীদিনে হামলার পরিকল্পনা করতে পারে আওলাকির বাহিনী, ঠিক যে কায়দায় মুম্বাই-তে হামলা করা হয়েছিল কিছুদিন আগে। প্রসঙ্গত, বিশ্বের 'মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট'দের তালিকায় আওলাকির নাম এখন রয়েছে এবং ডেট্রয়েটে প্লেন-দুর্ঘটনার মূল পান্ডা হিসেবে সে চিহ্নিত। আওলাকির জন্ম আমেরিকায়, বেড়ে ওঠা ইয়েমেনে। আপাতত ইয়েমেনেই সে আত্ম গোপান করে রয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর। বৃটেনের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক 'ডেইলি টেলিগ্রাফে'র একটি প্রতিবেদন বলছে, বৃটিশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল এয়ার সার্ভিস (এস এ এস)-কে ইয়েমেনে পাঠানো হয়েছিল আওলাকি-কে খুঁজে বার করতে। এমনকী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পর্যন্ত আদেশ দিয়েছিলেন আক্রমণ করে এবং বিশেষ বাহিনী পাঠিয়ে আওলাকিকে খুঁজে বার করতে। যদিও আওলাকি এখনও একজন মার্কিন নাগরিক।

যে রিপোর্টটি বৃটিশ সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, তাতে বলা রয়েছে আওলাকি একজন ইংরেজি বলা জেহাদী আদর্শবাদী ব্যক্তি হিসেবে আল-কায়দায় মতো জঙ্গি সংগঠনে নিজের অবস্থান পাকা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বছরের গোড়াতেই তার উত্তরোত্তর বাড়-বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আনোয়ার আল আওলাকির প্রতি সারা বিশ্বজুড়ে শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের আকৃষ্ট হওয়ার মূল কারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তার ইংরেজি ভাষায় দেওয়া ভাষণের বিশ্বজুড়ে প্রচারিত হওয়া। তিনি দু'বছর হলো লন্ডন ছেড়েছেন। ২০০৪ থেকে লন্ডন ছাড়ার আগে পর্যন্ত সেখানে তাঁর চরমপন্থী অনুসরণকারীদের নিয়ে একটি উগ্রপন্থী ভিত্তি তৈরি করার প্রচেষ্টা হয়। শুধু তাই নয়, বৃটেনে অবস্থানকালে বিভিন্ন মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিকট পাঠ-চক্রের (ক্লোজ-স্টাডি সার্কেল) নিয়মিত উগ্র মৌলবাদী বক্তৃতা করতো আওলাকি। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যুবকের কথা জানা গেছে যে সে আওলাকির সঙ্গে পরিচয়ের পরে উগ্রপন্থীদের দলে নাম লেখায় এবং চলতি জুন মাসেই আত্মঘাতী হামলা চালায় সেই যুবকটি। এম ১৫ ও পুলিশের আশঙ্কা, এরকম কত যুবক যে বৃটেনে লুকিয়ে আছে, তার পরিসংখ্যান কে জানে। এরা কখন যে আত্মঘাতী বোমারু রূপে উদয় হবে, দুশ্চিন্তা তা নিয়েই।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, আওলাকি বর্তমানে সেই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদেরই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যারা শিক্ষার্থী-সন্ত্রাসীদের গ্রুমিং করবে। ২০০৬-এর আগস্টে ট্রান্স-অতলান্তিক এয়ারলাইনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া আব্দুল আহমেদ আলি জানিয়েছে আওলাকি তাদের দলেই ছিল। সম্প্রতি আল-কায়দার পক্ষ থেকে আওলাকির একটি ৪৫ মিনিটের সাক্ষাৎকার ইন্টারনেটের ইউ-টিউবের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। তাতে আমেরিকা, কানাডা এবং বৃটেনের চোদ্দটি জায়গায় সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর ঘটনার কথা সে স্বীকার করে নিয়েছে। বৃটিশ সরকার ওই ইউ টিউবটিকে বিশ্লেষণ করে দেখেছে, গত বছর তাতে ১,৯১০টি ভিডিও রেখেছিল আওলাকি।

বীজ কেলেঙ্কারির শিকার

(৪ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় সরকারও সামিল হয়ে পড়েছে। সাধারণের বিক্ষোভের ফলে সাময়িক বিটি বেগুন বীজ বিক্রি বন্ধ থাকলেও ভবিষ্যতেও যে তা বন্ধ থাকবে কে বলতে পারে!

ভারত বিশ্বে ৮ম বৃহৎ বীজ বাজার। যে কোনও কোম্পানি বছরে ১ কোটি ডলারের কারবার করে। এমনকী বীজ সংক্রান্ত সরকারি ও বেসরকারি ব্যবসায় কর্পোরেট মালিকানা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে প্রায় ৭৫ কোটি কৃষকের ও তামাম সাধারণ মানুষের সব্জি উৎপাদকদের ভাগ্য এইসব মুনাফাবাজ কোম্পানিগুলির হাতেই ঝুলছে। এজন্য জাতীয় জৈব উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ অধিকরণ বিষয়ক ২০০৯ (এন বি আর এ আই) আইন পাশ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিভিন্ন কোম্পানির চুক্তিপত্র প্রকাশ না করার পিছনে সরকার সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণ দেখাচ্ছে। অথচ দেশে ও দেশের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার ভার সরকারের হাতেই।

আন্তর্জাতিক

বাবরি ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে ছক কষছে দাউদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৯৩-এ মুম্বাই ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী ও অভিযুক্ত মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিম ও তাঁর সহযোগী টাইগার মেমন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র কারখানা করার ছক কষছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিবি আই) গত ১৪ জুন মুম্বাই আদালতকে একথা জানিয়েছেন। দাউদ কোম্পানীর উদ্দেশ্য হলো বাবরি কাঠামো ধবংসের প্রতিশোধ নেওয়া।

সম্প্রতি আরব আমীরশাহী থেকে ধৃত এবং ভারতের কাছে প্রত্যর্পিত তাহির মার্চেন্ট ওরফে তাহির টাকলাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সি বি আই উপরোক্ত তথ্য জানতে পেরেছে। তাহির ১৯ জুন পর্যন্ত পুলিশী হেফাজতে থাকার কথা। সিবি আই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের (রিমাণ্ড) জন্য লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছে। ১৯৯৩-এর বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত ও পলাতক আয়ুব মেমনদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী হলো তাহির মার্চেন্ট। দুবাই চক্রান্তের বৈঠকেও হাজির ছিল তাহির। সি বি আই এরকমই দাবী করেছে।

এছাড়াও মার্চেন্ট কমবয়সী কিশোরদেরকে নিজেদের তৈরি তথ্যচিত্র দেখিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদে উস্কানী দিত বলে সি বি আই অফিসাররা জানিয়েছেন। সেজন্য ভারতীয় (মুসলিম) কিশোরদের তাত্ত্বিক সমর্থন দিত তাহির, সঙ্গে উত্তেজক উস্কানি তো ছিলই। তারপর ওই কিশোরদের দুবাইয়ে জেহাদি প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানোর কাজ করত তাহির।

টাডা আদালত তাহির মার্চেন্টের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। ১৯৯৩-এর বিস্ফোরণের ঘটনার পরপরই তাহির গা-ঢাকা দেয়। ২০০৪-এ ইন্টারপোল তাহিরের বিরুদ্ধে রেডকর্ণার নোটিশ জারি করে। পরের বছরই দুবাই পুলিশ তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে।

আসামীপক্ষের আইনজীবী রিজওয়ান মার্চেন্ট সি বি আই তাহিরকে স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। তাহিরের স্ত্রী এক চিঠিতে উকিলবাবুকে জানিয়েছেন যে, তাহির স্বীকারোক্তি দিতে চান না।

সিবি আই-এর বক্তব্য, মার্চেন্ট জেনেশুনে অনেক তথ্য গোপন করছে। ফলে অসুবিধা হচ্ছে। সেজন্য হেফাজতে নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে স্বাভিমানবোধে অটল ইজরায়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও চূড়ান্ত স্বাভিমানবোধ ও সার্বভৌমত্বের পরিচয় দিল ইজরায়েল। গাজা স্ট্রিপে ঘেরাবন্দী মুসলমানদের ভাইদের উদ্দেশ্যে তুরস্ক ত্রাণ পাঠিয়েছিল। তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল সামুদ্রিক জাহাজের এক কনভয়। নোঙর ফেলার আগেই ইজরায়েলী কম্যাণ্ডোরা সেই জাহাজে হানা দেয়। আক্রমণে চারজন প্যালেস্টানীয় মারা যায়। তারপর সর্বত্র ইজরায়েলী হানার বিরুদ্ধে

ইহুদ বারাক

সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও দেশের পক্ষ থেকে। আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী ওঠে। ওই সমালোচনার বিরুদ্ধে ইজরায়েল-এর বক্তব্য ছিল— ডাইভারের ছদ্মবেশে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী (মুসলিম) ওই জাহাজে ছিল। যেটা ত্রাণতরীর চরিত্রের বিপরীত।

যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে উড়িয়ে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইহুদ বারাক। তবে তিনি তাঁর দেশের সংসদকে জানিয়েছে, 'ইজরায়েলই তদন্ত করবে যে গাজা স্ট্রিপে ইজরায়েলের অবরোধ এবং কমান্ডো হানায় আদৌ আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ হয়েছে কিনা! চারবছর যাবৎ ঘেরাবন্দী বিষয়েও পুনর্বিবেচনা করা হবে।' প্যালেস্টাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী 'হামাস'-ই কার্যত গাজা নিয়ন্ত্রণ করে।

এমনিতে ইজরায়েলের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক ভালোই। তবে এই আক্রমণের পর হয়তো সেই স্বাভাবিকতা থাকবে না। ইতিমধ্যে এক সপ্তাহের বেশি সময় অতিক্রান্ত দশহাজার টন মালবাহী সাতটি জাহাজের কনভয় মানবিক ত্রাণ নিয়ে গাজায় যাচ্ছিল। এখনও সেই জাহাজ গাজায় পৌঁছাতে পারেনি। এজন্য, ইজরায়েল এবং জঙ্গি জিহাদী ইসলামিক সংগঠন 'হামাস' একে অপরের প্রতি দোষারোপ করে চলেছে। 'হামাস'-ই ইজরায়েল লাগোয়া গাজা ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। হামাস-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব কোনও নতুন ঘটনা নয়। হামাসের আত্মঘাতী প্রমীলা বাহিনীও আছে। তারা আগে অনেক নিরীহ ইজরায়েলীকে হত্যা করেছে। এছাড়া হামাস ইজরায়েলের সীমান্ত দিয়ে গাজায় ত্রাণ নিয়ে আসারও বিপক্ষে। সেজন্য ইজরায়েল প্যালেস্টাইন সরকারের শাসনাধীন ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দিয়ে গাজায় ত্রাণসামগ্রী পাঠাতে চেষ্টা করছে। 'হামাস' আবার প্যালেস্টাইনের সরকারি প্রধান মেহমুদ আববাস-এর প্রবল বিরোধী। 'হামাস'-এর মুখপাত্র ফাউজি বারহুম জানিয়েছেন, গাজার বিষয়ে ইজরায়েল অনেক শর্ত আরোপ করেছে। প্রসঙ্গত, গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক একসময় ইজরায়েলেরই দখলে ছিল। আমেরিকার হস্তক্ষেপে ইজরায়েল সেখান থেকে শর্তসাপেক্ষে সরে আসে। গাজাতে ইমারত তৈরিতে যে সিমেন্ট যাবে সেক্ষেত্রেও বাড়ির চরিত্র দেখেই ইজরায়েল ছাড়পত্র দেয়। ইজরায়েলের এই উদাহরণ থেকে ভারত কি কোনও শিক্ষা নেবে?

১৯৭০-এর ব্রাজিলই কি সর্বশ্রেষ্ঠ দল ?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের মেক্সিকো বিশ্বকাপের ব্রাজিল দলটিই কি সর্বশ্রেষ্ঠ দল? এই প্রশ্নে বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞরা দ্বিধাবিভক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মহলের ধারণা ওই ব্রাজিল দলটি

ধারেভারে এতটাই শক্তিশালী ছিল যে সেই দলের বিরুদ্ধে সর্বকালীন বিশ্ব একাদশ গড়ে মাঠে নামলে হেরে যাবে। কার্লোস আলবার্তোর দলটি ফিফা ঐতিহাসিকদের ভোটে ৯০ শতাংশ ভোট পেয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক নম্বর দলের স্বীকৃতি পেলেও কেউ কেউ ১৯৫৪-র হাঙ্গেরি দলটিকে একটু হলেও এগিয়ে রাখতে চান।

'৭০-র বিশ্বকাপ হয়েছিল মেক্সিকোতে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০০০ ফিট উচ্চতায় বিশ্বকাপ হওয়ায় অনেক দল শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হওয়ায় অনেক বড় দলের বেশকিছু তারকা ফুটবলার টুর্নামেন্টের মাঝপথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। ইংল্যাণ্ড, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল দলগুলি টুর্নামেন্ট শুরুর ১৫ দিন আগে মেক্সিকো চলে এসেছিল পরিবেশ ও আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে। তবে চাম্পিয়ন ব্রাজিল প্রস্তুতি শিবির বসায় আন্দিজ পর্বতমালার এক মনোরম উপত্যকায়। তাই ব্রাজিল সবদিক থেকে তৈরি হয়ে মেক্সিকো এসেছিল।

টুর্নামেন্টে শুরু থেকেই ব্রাজিল চমৎকার ছন্দবদ্ধ ফুটবল খেলে আগাম জানান দিয়ে দিয়েছিল যে তারা এবার কাপ জিততেই এসেছে। ১৯৫৮, ১৯৬২ পরপর দুটি বিশ্বকাপ জিতে ৬৬-র আসরে হোঁচট খায় পেলে, গ্যারিঞ্চার ব্রাজিল। ৬৬-র বিশ্বকাপ অবশ্য আরেক কালো হীরে ইউসোবিওর বিশ্বকাপ হিসেবে খ্যাত। পেলেকে সেবার প্রতিটি ম্যাচে মেরে তার ও ব্রাজিল দলের মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। হট ফেভারিট ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নেওয়ায় ইংল্যাণ্ডের কাপ জেতার রাস্তা সহজ হয়ে যায়। ইউসোবিওর পর্তুগাল শেষ চারে উঠে ইংল্যাণ্ডের কাছে হার স্বীকার করে।

১৯৭০-এ তাই ব্রাজিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আসরে নামে। তৃতীয়বারের মতো কাপ জিতে সোনার পরী জুলে রিমে কাপ চিরতরে ব্রাজিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এতটাই মরীয়া ও আত্মপ্রত্যয়ী ছিল ব্রাজিল। আসলে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার ফুটবল হলো ধর্ম-সংস্কৃতি। জাতীয় জীবনে ফুটবলই প্রাণসঞ্চারী আত্মা। আর বিশ্ব ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জুলে রিমে ট্রফি যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বজনীন আবেগ ও চেতনা। অলিম্পিক সোনা জেতার চেয়েও মহার্ঘ এই জুলেরিমে বা সোনার পরী হস্তগত করা। তাই মেক্সিকো বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ থেকেই তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, বলীয়ান ব্রাজিল অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়েছিল।

সেবারের ব্রাজিল টিমটা ছিল মণি-মাণিক্যেভরা। স্বয়ং পেলে ছিলেন যার মধ্যমণি। তার সঙ্গে ছিলেন বিশ্ব ফুটবলের অমর সব বর্ণময় চরিত্র। টোস্টাভ, ডিডি, জেয়ার জিনহো, রিভেলিনো, অধিনায়ক আলবার্তো, জর্জিনহোর মতো জিনিয়াসরা যে দলে, তার চাম্পিয়ন হওয়া কে আটকাবে? লাতিন আমেরিকায় ব্রাজিলের শত্রু দেশ উরুগুয়েকে ঝড় তুলে হারিয়ে ব্রাজিলের কাপ অভিযান শুরু। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সেমিফাইনাল ম্যাচে যে উচ্চতায় উঠেছিল ব্রাজিলের ফুটবল, যা দেখে বরেণ্য দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, এ যেন স্বর্গীয় স্বপ্ন। ওই ম্যাচে ব্রাজিলের নান্দনিক অথচ চরম আক্রমণাত্মক ফুটবলের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডিফেন্ডার ববি মূর ও গোলকিপার গর্ডন ব্যাঙ্কস।

পেলের বিরুদ্ধে মূরের দ্বৈরথ দেখে মোহিত হয়ে যায় গোটা বিশ্ব। পেলের একটি হেড যেভাবে গোলপোস্টের এক প্রান্ত থেকে উড়ে অন্যপ্রান্তে গিয়ে বাঁচান গর্ডন ব্যাঙ্কস, যা এখনও শতাব্দীর সেরা সেভ হিসেবে অভিহিত। ফাইনালে শক্তিশালী ইতালি খড়কুটোর মতো উড়ে যায় ব্রাজিল ঝড়ে। কে ছিলেন না ইতালি দলে। দুই সোনার টুকরো পিয়ালি রিভেরা, সুইলি রিভা ফরোয়ার্ড লাইনে। ডিফেন্সে মাজোলা, কাচেভি। মাঝমাঠে বনিনসেগনা। ওজনে ও উৎকর্ষতায় ব্রাজিলের সমকক্ষ। ডিফেন্স এতটাই মজবুত ও ইতিবাচক যে ম্যাচের আগে অনেক বোদ্ধাই ইতালিকে এগিয়ে

পেলে

রেখেছিলেন। ম্যান মার্কিং ও জোনাল কভারিং, দু'ধরনের রক্ষণেই ক্যাটানোচিও ঘরানার জন্য বিখ্যাত ইতালিয়ান ফুটবল ব্রাজিলকে হারিয়ে তৃতীয়বার কাপ জিতে রোমের মানুষকে সাতদিন ধরে উৎসব পালন করার সুযোগ দিতে চান, এমন উদ্দীপনা নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন।

১৯৩৪, ৩৮ পরপর দুবার বিশ্বকাপ জিতেছিল ইতালি। অন্যদিকে ৫৮, ৬২-র বিশ্বকাপ উঠেছিল ব্রাজিলের হেফাজতে। তাই বিশ্বফুটবলের দুই মহাশক্তির দেশের লড়াই দেখতে আজটেক স্টেডিয়ামে একটা আসনও খালি পড়ে ছিল না। টেলিভিশনে চোখ রেখেছিলেন কয়েক কোটি মানুষ। আই ও সি ও রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবসহ দুনিয়ার প্রতিটি দেশের মানুষ ওই ৯০ মিনিট সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইতালির যাবতীয় জারিজুরি ম্যাচের ১৫ মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দেয় পেলে অ্যান্ড কোম্পানী। আসলে পেলে যে সুপার ন্যাচারাল জিনিয়াস। কোনও সিস্টেম দিয়ে তাকে অকেজো করা যায় না। তার এক একটা মুভে পাহাড়ের মতো অটল ইত্যালির ক্যাটানোচিও ডিফেন্স তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। যোগ্য সঙ্গত করেছিলেন টোস্টাড, জেয়ারজিনহো, রিভেলিনোরা।

৪-১ গোলে জিতে সোনার পরীকে যোগ্য দেশেই চিরকালের মতো নিয়ে যায় জাগালোর ছেলেরা। ওই বিশ্বকাপে ব্রাজিলের খেলা দেখে ফিফা রায় দেয় কোনওকালেই কোনও দলের পক্ষে ব্রাজিলের তুল্য ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। এর থেকে বড় স্বীকৃতি আর কি হতে পারে?

১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দল।

শব্দরূপ - ৫৫২

নির্মলা সাহা

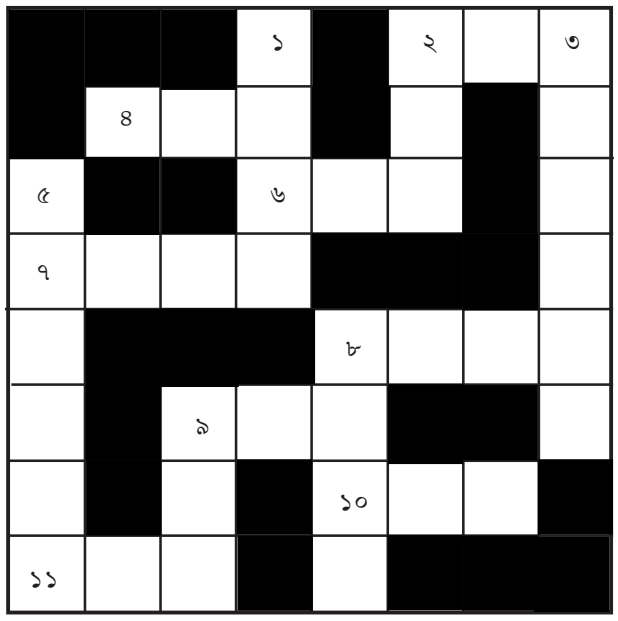

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. কৈলাস পর্বতে শয়ন করেন বলে মহাদেব-এর এই নাম, ৪. একই নামে বলরামের পত্নী ও সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের শেষ নক্ষত্র, ৬. বায়ুর অধিদেবতা, ৭. মহানুভব, মহাত্মা, দুয়ে-চারে গজ, ৮. পরাশয় ও সত্যবতীর পুত্র, শেষ দুয়ে বৃত্তের সর্বাধিক প্রস্থ, ৯. তৎসম শব্দে নৌকার হাল বা দাঁড়, ১০. উত্তরের বিপরীত দিক, ১১. চোখ, কটাক্ষ, অপাঙ্গদৃষ্টি।

উপর-নীচ ঃ ১. স্ত্রীর পরিচয়ে মহাদেব, ২. তৎসম শব্দে গলাধঃকরণ করতে হবে, গেলা, ৩. দুর্গা কালী প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতার ভজনাকারী, ৫. পদ্মের মতো চক্ষু, এক-তিনে যন্ত্র, দুয়ে-ছয়ে হৃদয়, ৮. বেতের ছড়ি, এক-তিনে হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, ৯. উপাসনা বা পূজা তৎসম শব্দে।

সমাধান শব্দরূপ ৫৫০

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।

বি	■	গা	ঙ্গী	ব	■	ক	■
ম	■	ন্ধা	■	উ	ত্ত	ম	■
ল	হ	রী	■	ল	■	ণ্ড	■
দা	■	■	■	■	ক	লু	য
ন	গে	ন্দ্র	■	■	■	■	ষ্ঠী
■	রো	■	ভৈ	■	ম	ন্দ	র
■	বা	ন	র	■	ণ্ডু	■	কৃ
■	জ	■	ব	টু	ক	■	পা

● ৫৫২ সংখ্যার সমাধান আগামী ১২ জুলাই, ২০১০ সংখ্যায়

হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস উৎসব

বাসুদেব পাল।। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী। এই তিথিটি ভারত তথা বিশ্বের হিন্দু সমাজের কাছে এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য বয়ে আনে প্রতিবছর। তার কারণ, সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের দীর্ঘ মুসলমান শাসনকালে প্রবল প্রতাপশালী মোগল সম্রাটকে একরকম চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ওই তিথিতেই রাজ্যাভিষেক হয়েছিল মহারাজা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের। যে যুগে সারা দেশের হিন্দুরাজারা মোগল দরবারে নিজেদের সমর্পণ করাতে গর্ব অনুভব করতেন। বাড়ির মেয়েদের মোগল সম্রাটের হারেমে পাঠিয়ে চরম বিজাতীয় হীনমন্যতার পরিচয় দিচ্ছেন, তখনই শিবাজী মহারাজ নিজের ক্ষমতা, ধী ও চাতুর্যে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করেছেন, নিজেকে গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে দিনটি ছিল ১৬৭৪ খৃস্টাব্দের ৬ জুন। এবছর তিথিটি ২৪ জুন, বৃহস্পতিবার। ওইদিনের বর্ণনা শুনলে আমরা অবাক হয়ে যাব যে, বিশাল ভারতবর্ষের এক ছোট এলাকার রাজার রাজ্যাভিষেক কীরকম জাঁকজমক সহকারে হয়েছিল।

ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রকাশিত।

খুব ভোরে উঠে শিবাজী প্রথমে বিধিমতো স্নান সেরে কুলদেবতা 'মহাদেব ও মা ভবানীর' পূজা করেন। তারপর কুলগুরু বালম্ ভট্ট, কুলপুরোহিত গাগা ভট্ট এবং অন্যান্য পণ্ডিত ও সাধুদের বন্দনা করে বস্ত্র এবং অলঙ্কার দান করে শেষ করে দেন। তারপর শ্বেতশুভ্র বস্ত্র পরিধান করে অভিষেকের জন্য নির্দিষ্ট দু'ফুট লম্বা-চওড়া সোনার চৌকিতে বসলেন। পাশে বসেছিলেন, রাণী সোহরাবাঈ। পিছনে যুবরাজ শম্ভাজী। আট কোণে আটটি সুবর্ণ কলস। আটটি ঘটে গঙ্গা, সপ্ত মহানদী এবং অন্যান্য বিখ্যাত নদ-নদী-সমুদ্র-তীর্থস্থানের জল। প্রত্যেক কলসের কাছে অষ্টপ্রধানের এক একজন দাঁড়িয়ে। অভিষেক লগ্নে তাঁরা সেই জল শিবাজী, মহারাণী ও রাজপুত্রের মাথায় ঢেলে দিলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের স্তোত্র-মন্ত্র পাঠে, মঙ্গলবাদ্যে আকাশ-বাতাস মুখরিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হলেও তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব তখনকার ভারতীয়রা কতটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তা জানা নেই। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্বে জন্মগ্রহণ করে তার মহত্ব বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার। তাই তিনি সঙ্ঘের ছয়টি উৎসবের মধ্যে অন্যতম উৎসব হিসেবে শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের দিনটিকে 'হিন্দুসাম্রাজ্যদিনোৎসব' বলে গ্রহণ করেছেন। আর একজন হলেন— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবছর তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। তিনি 'শিবাজী উৎসব' নামে কবিতা লিখে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, সেদিন বাঙালী আপনার বার্তা সঠিকভাবে গ্রহণ করে উঠতে পারেনি, হীন, দস্যু বলে পরিহাস করেছে। সেটা তাই পুষিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব' পালন করে স্বকণ্ঠে কবিতাটি আবৃত্তি করে।

শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী (জন্ম ১৬০৮, মৃত্যু ১৬৮১ খৃঃ) ছিলেন তৎকালীন মহারাষ্ট্রে সর্বজনপূজ্য সন্ত মহাপুরুষ। একবার শিবাজী তাঁর গুরুকে ভিক্ষা করতে দেখে তাঁর রাজত্ব লিখিতভাবে গুরুর কাছে সমর্পণ করেন। রামদাস শিবাজীকে 'গোমন্তা' বলে রাজ্য শাসন করতে বলেন, রাজ্যের পতাকা গৈরিক করতে আদেশ দেন। শিবাজীর দীক্ষা মন্ত্র ছিল—"শ্রীরাম, জয় রাম, জয় জয় রাম।"

শিবাজী এক অতুলনীয় মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি মধ্যযুগের ভারতে এক অসাধ্যসাধন করেন। তাঁর আগে কোনও হিন্দুই শক্তিমান মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সমর্থ হয়নি। প্রায় সকলেই পরাজিত অথবা বশ্যতা স্বীকার করেছিল। তবুও এক সাধারণ জায়গিরদারের পুত্র হয়ে শিবাজী ভয় পাননি। বিদ্রোহী হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছেন। কারণ, শিবাজীর চরিত্রে সাহস ও স্থৈর্যের এক অপূর্ব সমাবেশ হয়েছিল। তিনি নিমেষে বুঝতে পারতেন— কোথায় কতদূর এগোতে হবে, কখন থামতে হবে, কোথায় কখন কোন্ নীতি অবলম্বন করতে হবে। সীমিত লোকবল ও অর্থবলে ঠিক কি কি করা সম্ভব। এটাই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। কার্যদক্ষতা ও বিষয়-বুদ্ধিই তাঁর জীবনে আশ্চর্য সফলতার কারণ। গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের বাইরে শিবাজী ছাড়া আর কেউ এরকম ক্ষমতা দেখাতে পারেননি। স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করে শিবাজী প্রমাণ করেছিলেন, সেই সময়ের হিন্দুরাও রাষ্ট্রের সব বিভাগের কাজ চালাতে পারে। শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে, জলে-স্থলে যুদ্ধ করতে, দেশে সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষণ করতে, বাণিজ্যপোত গঠন ও পরিচালনা করতে, ধর্মরক্ষা করতে হিন্দুরা সমর্থ। রাষ্ট্র-শরীরকে পূর্ণতা প্রদানের শক্তি হিন্দুদের রয়েছে।

নির্বেদ-অরুণাভ-শঙ্কর-মান্নান দীপা-রা এখন কী করছেন?

বিশাখা বিশ্বাস

ক্ষমতাপ্রাপ্তির পরই বাংলার বামমার্গী বন্ধুরা ঐতিহাসিক মনুমেন্টের শিরোদেশের রঙ পাল্টে 'লাল' করে দুইটি অভারতীয় এবং বিধর্মী শব্দে নামকরণ করেছিলে 'শহীদ মিনার'। কলকাতা জয়ের পর তার বঙ্গবিজয় সম্ভব হলে মমতা ব্যানার্জীর দল শহীদ মিনারের রঙ লাল পাল্টে সবুজ করে দেবেন নিশ্চিত— কিন্তু তার বর্তমান নাম পাল্টাবার সাহস তার থাকবে কী?

ভোগের খতিয়ানে সম্পদের বিশ্বরেকর্ডে টইটম্বুর সিপিআইএম বয়ে নিয়ে চলেছিল স্বাস্থ্য-শিক্ষা, শান্তি-শিল্প এবং প্রশাসনিক দক্ষতার অপঘাত ও অপমৃত্যুর লাশ। আপাত নিরপেক্ষতা নামক বস্তুটিকে হাটেবাজারে বিক্রী করে নির্লজ্জ একদেশদর্শিতাকে মূঢ়ের মতো প্রচার করে চলেছিল সে আপন মহত্ব বলে। একদিকে চলছিল শান্তি-শঙ্কা-হীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ সৃষ্টি করে দেহমাংস ও শরীর-লোলুপতার কল্পস্বর্গ নির্মাণ, অন্যদিকে ক্ষুধিত কৃষকের আত্মার থলি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নে পূজার্চনা চলছিল পুঁজির। একদিকে প্রচার চলছিল কমিউনিস্টদের শক্তির উৎস হলো সর্বহারা মানুষের মানবতার নতুন সাধনা, অন্যদিকে সেই সব দরিদ্র মানুষের মানবতার সমস্ত রূপ এবং সজ্জাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মনুষ্যত্বের সমস্ত বন্ধনকে অতিক্রম করে চলছিল কেবলমাত্র 'পেট' ও 'পার্টী'র সত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। বহুমুখী ফলশ্রুতি হলো উন্মত্তের দুরাকাঙ্ক্ষা, সাধারণের দুঃস্বপ্ন এবং বিরোধীপক্ষের জন্যে বিচিত্র বিভীষিকা। সিঙ্গুরের বর্বরতায় রাজ্য গোয়েন্দা প্রধানের প্রতিবেদনে তাই বানানো হলো কিশোরী কুমারী তাপসীর মৃত্যুর কারণ নাকি তারই পিতার সাথে তার আসংগলিপ্সা। নন্দীগ্রামে নামলো চটিপরা পুলিশ, সিঙ্গুরের পথে অবরুদ্ধা মমতার রক্ষক পুলিশই হলো তার শ্লীলতার ভক্ষক। সনিয়া গান্ধীকে দীর্ঘ সাড়ে চারটি বছর 'তেল ইলিশ' নামক বাঙালী খানা খাইয়ে এসে প্রকাশ-ঘরণী আন্দোলনকারী বিরোধীদের জন্যে প্রেসক্রাইব করলেন 'দমদম দাওয়াই'। অত্যুৎসাহী নামীদামি হেকিম-কোবরেজগণের কেউ সাথে সাথে ভাঙতে চাইলেন বিরোধী আন্দোলনকারীদের ঠ্যাং, কেউ দিতে চাইলেন 'আড়ং ধোলাই', চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে কেউ তাদের লাইফ-কে করে দিতে চাইলেন 'হেল', ছাব্বিশ দিনের অনশনরতা মমতাকে কেউ বল্লেন সার্কাসের নেত্রী, কেউ ব্যক্ত করলেন তার চুলের মুঠি ধরে টেনে আনার শক্তিমত্তা, মেধার আন্দোলনে পিঠে পুলিশী-লাঠির আঘাত খেয়ে তিনি তার সম্মুখে দেখলেন সারি সারি উন্মুক্ত 'পাছা'—যে পাছার ইতিহাসে আবার ঘোষিত হলো "মমতার মাথার বুদ্ধি তার পাছায় নেমে এসে তাকেই (নাকি) করেছে মোটা।" বর্বরতার এই সর্বগ্রাসী সংস্কৃতির মহাপ্লাবনে যখন নন্দীগ্রামে কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছেন নব্য সংস্কৃতির 'নতুন সূর্যোদয়'—সংস্কৃতির বরপুত্র 'ভগবান বুদ্ধ' তার অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন আমরা ২৩৪, ওরা মাত্র তিরিশ এবং তারপরই শরীরি বিভঙ্গে কনুই ভাঁজ করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পুলিশকে বলেছিলেন 'আপনাদের কাজ আপনারা করুন, চার্জ দেম আউট, ওসব মানবতা টানবতা আমি বুঝে নেবো'। সভ্যতার ওপর ভদ্রবেশী নেতৃত্বের এই বলাৎকারে যখন হতভম্ব বুদ্ধিজীবীগণ, যখন পাড়ার মস্তানের কণ্ঠে কুমারী কিশোরী' ছাত্রীদের মতো হতচকিত মানুষ যেন শুনছিলেন সেই সব গানের কলি 'আজাও, আজাও, ম্যায় রেপ করুঙ্গা—'আত্মসম্মান'-সচেতন মান্নান-শঙ্কর-দীপা দাসমুন্সী এবং পাউডার বিলাসী অরুণাভ-নির্বেদ রায়রা তখন কোথায় ছিলেন?—না, গণশক্তি ও আজকাল নিয়ে 'আনন্দের বাজারে' বসে তোল্লা পেতে পেতে '২৪ ঘণ্টা'-ই 'আকাশ'-এর দিকে চেয়ে চেয়ে আকাশ-কুসুমের শয্যা প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিলেন।....

তারপর যখন সারা রাজ্যে মানুষের প্রাপ্য কেড়ে নিতে টাটা-সালিম-জিন্দেল রাজারহাটে নয়াচরে সর্বত্র নেমে এলেন, যখন মার্ক্সবাদী জীর্ণ শেষ প্রাচীরের ওপর রৌদ্রকে খণ্ডিত হয়ে পড়তে দেখে মানুষ চমকে উঠলো, অত্যাসন্ন অন্ধকারের আবর্তে মানুষের প্রাণবায়ু যখন প্রতিহত হয়ে উঠলো, মানবজীবন 'আমরা' এবং 'ওরা'-য় বিভক্ত হয়ে পড়লো, বাংলার বুদ্ধিজীবীরা নন্দনের সুদৃশ্য মার্বেল পাথরের অলিন্দ ছেড়ে দলে দলে বেরিয়ে এসে যখন চীৎকার করে উঠলেন 'পরিত্রাহি, রক্ষা করো, আমরা বাঁচতে চাই, বাঁচার জন্যে পরিবর্তন চাই'— সদ্য গজানো ডানা ঝট্‌পট্ করে নতুন বিহঙ্গ শিশুর মতোই দীপা-মান্নান-শঙ্কর-নির্বেদ অরুণাভরা ঠিক তখুনি আওয়াজ তুললেন 'জোটও চাই, সম্মানও চাই'।....

বাঁচা গেল! রাজ্য কংগ্রেসের তাহলে সম্মান ছিল!

অতএব, 'সম্মানের যুদ্ধ' হলো, সে যুদ্ধ সাঙ্গও হলো। ত্রিমুখী লড়াই হলো, শেষও হলো। জোট ভাঙার গুপ্ত নির্দেশ দিয়ে 'আমাদের (যে) লোক'-টি সেদিন রাণাঘাটে সদম্ভে এক থেকে উনিশের তত্ত্ব শোনালেন, অভ্রভেদী আত্মঅহংকারে ঘোষণা করলেন 'কে কোথায় আছি তা' ২ জুন বোঝা যাবে'— নির্বাচনোত্তর পর্বে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতির 'পদ'-টি ত্যাগ না করে সনিয়া সকাশে কেবল তার ইচ্ছা প্রকাশ করে আবার তিনি বিদেশ যাত্রা করেছেন। অরুণাভ-নির্বেদ-শঙ্কর-মান্নান-দীপা দাসমুন্সীদের সবারই 'পদ'-গুলি মমতা ব্যানার্জির দল কেড়ে নিয়েছে (প্রত্যেককেই আপন আপন ক্ষেত্রে ধরাশায়ী করেছে), অতএব কেবল মলমূত্র নামক বর্জ্য পদার্থসমূহ পরিত্যাগ করে তারা তাই উদভ্রান্তের মতো দিশাহীনের মতো পর্দার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে মুখরক্ষা করছেন। তা' তারা এখন সেখানে কী কী করছেন?-না, পরবর্তী নির্বুদ্ধিতার জন্যে নির্লজ্জ রিহার্সাল দিচ্ছেন।

ক্ষমতাপ্রাপ্তির পরই বাংলার বামমার্গী বন্ধুরা ঐতিহাসিক মনুমেন্টের শিরোদেশের রঙ পাল্টে 'লাল' করে দুইটি অভারতীয় এবং বিধর্মী শব্দে নামকরণ করেছিলে 'শহীদ মিনার'। কলকাতা জয়ের পর তার বঙ্গবিজয় সম্ভব হলে মমতা ব্যানার্জীর দল শহীদ মিনারের রঙ লাল পাল্টে সবুজ করে দেবেন নিশ্চিত—কিন্তু তার বর্তমান নাম পাল্টাবার সাহস তার থাকবে কী? কিন্তু, সেকথা লেখা যাবে অন্য কোনও বারে।....

Swastika
21 June - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

ভাষণরত মোহন ভাগবত। বসে জে পি রাজখোয়া, দর্শনলাল অরোরা এবং শ্রীরাম হরকরে।

নাগপুরে সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ সমাপ্ত

সঙ্ঘের আহ্বানে যুবসমাজ ব্যাপকভাবে সাড়া দিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৭ জুন বিকেলে নাগপুরের রেশমবাগ ময়দানে প্রকাশ্যে সমাবেশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের সমাপ্তি হলো। ওইদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যসচিব জে পি রাজখোয়া। তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও দেশবাসীর সামনে তার মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন। শ্রীভাগবত তাঁর ভাষণে এবছরের জনগণনায় জাত-পাত লিপিবদ্ধ করার সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রতিবছরই মে-জুন মাসে দেশজুড়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের প্রশিক্ষণের জন্য তিন স্তরে সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ অনুষ্ঠিত হয়—প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ। প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষ প্রদেশ ও ক্ষেত্রস্তরে অনুষ্ঠিত হলেও তৃতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ বর্গ শুধুমাত্র নাগপুরেই হয়।

এবৎসর সারা দেশ থেকে ৮৮১ জন কার্যকর্তা 'তৃতীয় বর্ষ' প্রশিক্ষণের জন্য এসেছিলেন। ভোর চারটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ঠাসা দৈনন্দিন কর্মসূচী। নাগপুরের বিশিষ্ট সাংবাদিক অশোক সোহনী বর্গের কার্যবাহ ছিলেন।

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ভাগাইয়াজী জানিয়েছেন, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ যুবসমাজ সঙ্ঘের আহ্বানে ব্যাপক সাড়া দিচ্ছে। বর্তমানে যে যুবসমাজকে কেরিয়ারমুখী বলা হয় তারাই ভালো সংখ্যায় সংঘের বর্গে অংশগ্রহণ করে সঙ্ঘকার্যকে জীবনের অবিভাজ্য অঙ্গ বলে গ্রহণ করছে। সারা দেশে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের গড় আয়ু ২০ থেকে ২৫ বৎসরের মধ্যে। তারা সবাই সঙ্ঘকে জানতে আগ্রহী। সঙ্ঘই তাদের কাছে আশার আলো। কেরল এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্ঘের সাংগঠনিক রচনার ৩৯টি প্রদেশ থেকেই স্বয়ংসেবকরা নাগপুরে এসেছিলেন। তারমধ্যে মহাকোশল প্রান্ত (মধ্যপ্রদেশ) থেকে সর্বাধিক ৬০ জন এবং কেরল থেকে ৫৯ জন কার্যকর্তা এসেছিলেন। এরপর দক্ষিণ তামিলনাড়ু ৩০, উত্তর তামিলনাড়ু-১০, দক্ষিণ কর্ণাটক-২৬, উত্তর কর্ণাটক-২৩ , পশ্চিম অন্ধ্রপ্রদেশ-৪০, পূর্ব অন্ধ্রপ্রদেশ ২০, কোঙ্কণ-১২, পশ্চিম মহারাষ্ট্র-১৫, দেবগিরি-৮, গুজরাট-২৮, মধ্যভারত-৩০, মালব-৪০, ছত্তিশগড়-২১, চিতোর-২৫, জয়পুর-২৩, যোধপুর-১৬, দিল্লী-১৯, হরিয়ানা-১৭, পাঞ্জাব-৮, হিমাচল প্রদেশ-১৩, জম্মু ও কাশ্মীর-১০, উত্তরাঞ্চল-৩০, মীরাট-৩৫, ব্রজ-৩৮, কানপুর-২২, অবধ-১২, কাশী-৩৭, গোরখপুর-১৭, উত্তর বিহার-১০, দক্ষিণ বিহার-১০, ঝাড়খণ্ড-১৫, উৎকল-২৬, দক্ষিণবঙ্গ-১৮, উত্তরবঙ্গ-১১, উত্তর অসম-১১ এবং দক্ষিণ অসম প্রান্ত থেকে ১১ জন কার্যকর্তা বর্গে যোগ দিয়েছেন।

এবছর সারা দেশে ৪২ স্থানে প্রথম বর্ষ এবং ১৪টি স্থানে দ্বিতীয় বর্ষের বর্গ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া চল্লিশোর্ধদের জন্য ১৪টি বিশেষ বর্গের ব্যবস্থা ছিল।

নাগপুরের বর্গে ১৯টি ভাষাভাষী স্বয়ংসেবকরা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষকদের সংখ্যা ১৭২ জন, ১৪০ জন চাকুরীজীবী, স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কর্মরত ১৩২ জন, কৃষক ৭২, উকিল ২৩, ডাক্তার। ইঞ্জিনীয়ার, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এবং সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্তরাও ছিলেন।

২২ মে শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের পথ সঞ্চলন (Route March with band) নাগপুরের মানুষের নজর কাড়ে। স্বয়ংসেবকরা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর বাড়ি ঘুরে দেখে রোমাঞ্চিত। সবদিক দিয়েই যে এবারের বর্গ সফল তা নাগপুর বর্গ থেকে ফিরে আসা স্বয়ংসেবকদের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রকাশিত হবে ৫ জুলাই '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ৫ জুলাই '১০

তথ্যসমৃদ্ধ ও মননশীল বিভিন্ন রচনা নিয়ে এবারের

শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা

হিন্দুত্বের প্রহরী

সুলতানী আমল থেকে ইংরেজ আমল অথবা স্বাধীন ভারতবর্ষ—হিন্দুর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। নির্যাতিত আতঙ্কিত হিন্দুকে কালে কালে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন একেক জন মহান পুরুষ। প্রণবানন্দ, সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদ, ডাক্তারজী, বিপিনচন্দ্র পাল—এরকম ব্যক্তিত্বরাই তো ছিলেন হিন্দুত্বের প্রহরী। এঁদের স্মৃতিতর্পণে সাজানো এবারের শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যার অনবদ্য সম্ভার। সঙ্গে থাকছে তাঁর পৈত্রিক বাড়ি নিয়ে বহু অজানা তথ্য।

।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ ছয় টাকা।।
১৯ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন।

উত্তরবঙ্গের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ

(বাঁদিক থেকে) প্রদীপ অধিকারী, বিদ্রোহী সরকার, জগদীন্দ্র সরকার এবং স্বামী অনুপমানন্দজী।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মে-জুন মাসেই সাধারণভাবে সারা দেশ জুড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের জন্য শিক্ষাবর্গের আয়োজন হয়। এবার উত্তরবঙ্গের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ গত ৬ জুন থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ হাইস্কুলে শুরু হয়েছে। চলবে ২৬ জুন পর্যন্ত। ওইদিন বর্গের উদ্বোধন করেন স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী অনুপমানন্দ মহারাজ। বর্গের উদ্বোধনী ভাষণ দেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রান্তের সহকার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী, প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ, প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ উত্তম রায় এবং অন্যান্য অধিকারীবৃন্দ। বর্গের মুখ্যশিক্ষক আছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রচারক ধনেশ্বর মণ্ডল এবং কার্যবাহ তরুণ সরকার। বর্গাধিকারীর দায়িত্ব পালন করছেন জগদীন্দ্রনারায়ণ সরকার। পুণ্যতোয়া আত্রেয়ী নদীর পাড়েই সবুজ মোড়া এক মাঠে দু'বেলা শারীরিক অনুশীলন চলছে। ইতিমধ্যে বর্গ পরিদর্শন করে শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে, প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, সহক্ষেত্র প্রচারক অজিত মহাপাত্র প্রমুখ অধিকারীগণ।

বর্গে ৬৫টি স্থান থেকে ৯৪ জন স্বয়ংসেবক যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ থেকেও চারজন স্বয়ংসেবক আছেন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com